চলন্ত পিকচার্স

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

চায়ের কাপ-এ চুমুক দিতে দিতে যখন জানবেন আমাদের কাছে গচ্ছিত আপনার টাকা পূর্ব ভারতের চা-বাগিচা ও চা-রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ জুগিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে ও চা-শিল্পে নিযুক্ত ২৫০০০ শ্রমিকের রুজি-রোজগারে সাহায্য করে চলেছে। তখন চায়ের স্বাদ আপনার আরও ভালো লাগবে—নয় কি?
আমাদের কাছে
আপনার জমা টাকা
সুদে দ্রুত বাড়ছে,
ভাবতেও সুখ—
কিন্তু সে টাকা লাগছে,
সুখী-সমৃদ্ধ নতুন পশ্চিমবঙ্গ
গড়ে তুলতে,
এ গৌরবের তুলনা কোথায়!
সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য গড়ে তোলার ব্রতী
ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজি : অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস,
কলিকাতা : ৭০০ ০০১
হেড অফিস :
১৭, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

সম্পাদকীয়

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের শারদীয়া সংখ্যা তোমাদের সকলেরই যে ভালো লেগেছে, তা তোমরা চিঠি পত্রে জানিয়েছ। পূজা সংখ্যার প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার কবে দেওয়া হবে আগামী সংখ্যায় জানিয়ে দেব। সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের হাতে পৌঁছে যাবে চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের 'বড়দিন সংখ্যা'। এই বিশেষ সংখ্যার দাম বাড়ানো হবে না। এই প্রসঙ্গে সহযোগিতার জন্য আমরা আমাদের লেখক ও এজেন্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মনে রেখো কমিকস, নতুন স্বাদের লেখা ইত্যাদি নিয়ে বড়দিন সংখ্যা আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে।

অমিতাভ সেন
প্রধান সম্পাদক

সোহিনী প্রকাশনী ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা—১
দাম—দুই টাকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র

কিশোরদের একমাত্র গোয়েন্দা / অ্যাডভেঞ্চার / রোমাঞ্চ /
সায়েন্সফিকশান মাসিক পত্র

রহস্য উপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্ত / বাদশাহী মোহর ৭
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় / সার সত্যপ্রকাশ—বোম্বেটে ৩৫
সোনার রহস্য / কমিকস ৩৬
ভৌতিক গল্প
ডাঃ অভিজিৎ দত্ত / কবরের বাসিন্দা ৪২
গোয়েন্দা নাটক
উৎপল ভট্টাচার্য / গোয়েন্দার ধাঁধা ৪৩
হ্যাকেল বেরি ফিন
মার্কটোয়েনের / বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ১১
আলৌকিক গল্প
কিন্নর রায় / মায়ের স্মৃতি ৪৮
ঐতিহাসিক গল্প
রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় / হারানো উট ৫২
রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় / নীল মাকড়সা ৫৪
ফ্যান্টাসি
রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী / কাটাল চুরি ৫৮
সোহিনী পাল / মনে রেখো ৬
রহস্য গল্প
সুহাস চৌধুরী / সীমান্তের তীরে বিভীষিকা ৪
ছবি আঁকো / ছবি পাঠাও ৪
ছবিতে / গল্প প্রতিযোগিতা ৫

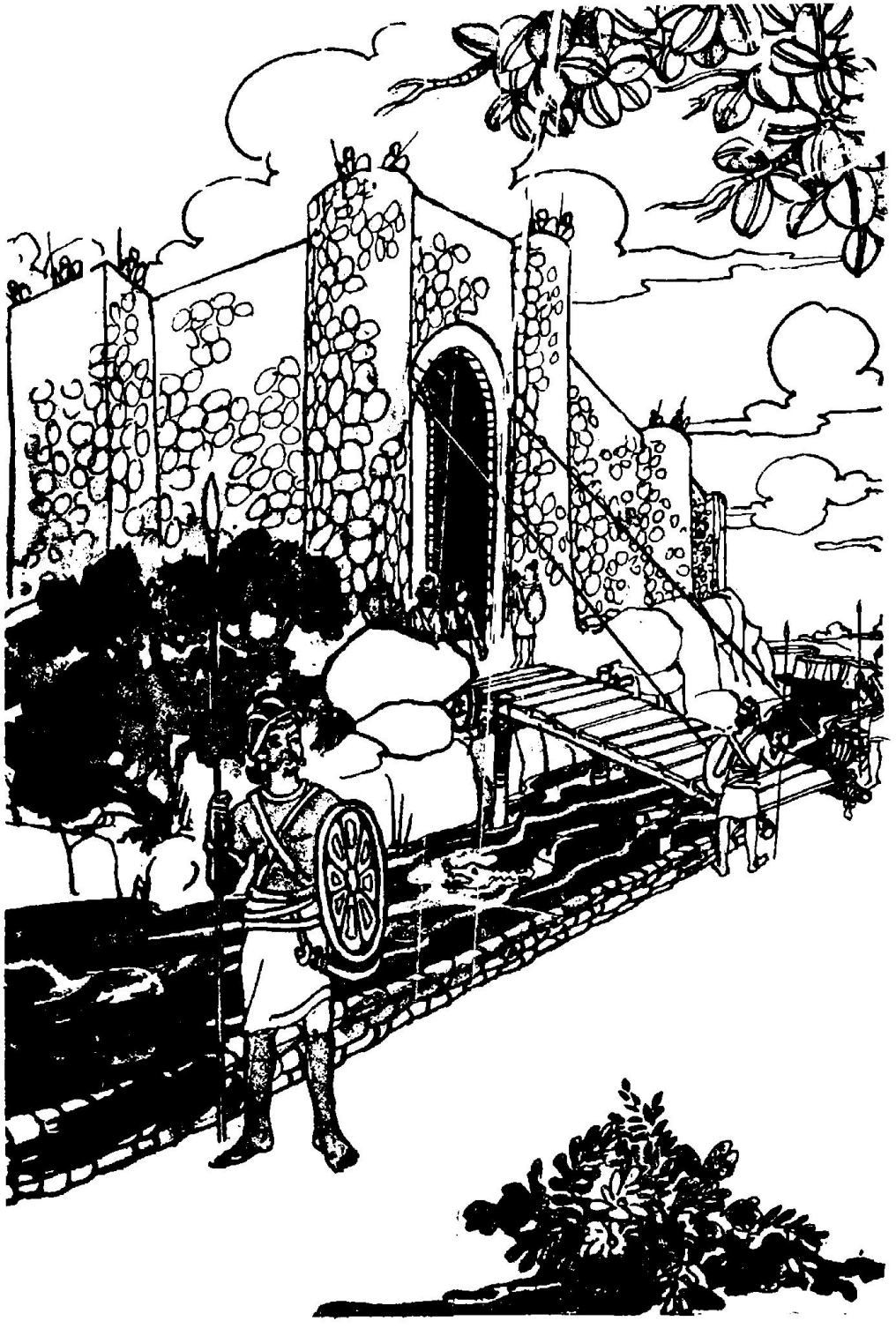

ছবি ১নং বাঁদিকের পাতায় দেখ।

উপরের ছবিটি দেখে নিজে একটা কাগজে আঁকো, রঙ দাও তোমার ইচ্ছামত। নিজের নাম ও ঠিকানা বয়স লিখে পাঠাও। যার ছবি ভালো হবে তাকে ১৫্ টাকা পুরস্কার পাঠান হবে। ছবি পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই ডিসেম্বর '৮১ মধ্যে।

ছবি ২নং

২৫্ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ঃ ছবি দেখে গল্প প্রতিযোগিতা

উপরের ছবিটি খুঁটিয়ে দেখ, তারপর এক পৃষ্ঠায় তোমার বক্তব্য গল্পে লিখে পাঠাও। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই ডিসেম্বরে ৮১। নিজের নাম / ঠিকানা ঠিক ঠিক লিখে পাঠাতে ভুলবে না কিন্তু।

মনে রেখো

সোহিনী পাল

খেলার খোঁজ-খবর

"ম্যারাথন রেস" কি ?

অলিম্পিক ক্রীড়ায় শ্রেষ্ঠ দৌড়-প্রতিযোগিতা—২৬ মাইল ২৮৫ গজ দৌড়। খ্রীষ্ট পূঃ ৫৯০ অব্দে পারস্যরাজ দরায়ুস কর্তৃক গ্রীসের এথেন্স নগরী হঠাৎ আক্রান্ত হইলে বিপন্ন এথেন্সবাসীরা 'ফাইডিপ্পাইডিস্' নামক এক শক্তিমান যুবককে সামরিক সাহায্য চাহিয়া—স্পার্টায় প্রেরণ করেন। যুবকটি এক দৌড়ে ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থল পৌছিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাস বিখ্যাত ম্যারাথনের যুদ্ধসম্পর্কিত ঘটনা। এই ঘটনার স্মারকরূপেই ম্যারাথনরেস্ প্রবর্তিত হইয়াছে।

এশিয়ান গেমস্ কি ?

এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ১৯৫১ সালের ৪ঠা মার্চ হইতে ১১ই মার্চ দিল্লীতে প্রথম এই ক্রীড়া আরম্ভ হয়। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর এই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

"ব্রতচারী" কি ?

৺গুরুসদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত সংঘ বিশেষ। চরিত্র গঠন, সমাজের কল্যাণ সাধন এই সংঘের উদ্দেশ্য।

কৃত্য ও নৃত্যের মাধ্যমে বাংলার যুবসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা।

বয়-স্কাউট কি ?

১৯০৮ সালে ইংলণ্ডের লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল বয়-স্কাউটের প্রথম প্রবর্তন করেন। বালক-বালিকাদিগকে চরিত্রবান, সদাচারী ও স্বাবলম্বী করাই স্কাউটিং-এর উদ্দেশ্য।

ডেভিস কাপ কি ?

লন টেনিস খেলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। লণ্ডনের উপকণ্ঠে উইমব্লেডন নামক স্থানে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড় ডি. এফ. ডেভিস ইহার প্রতিষ্ঠা (১৯০০ খ্রীঃ)।

দাবাখেলার উৎপত্তি কোন্ দেশে ?

ভারতবর্ষে। তিন হাজার বৎসর পূর্বে চতুরঙ্গ নামে এই খেলা প্রচলিত ছিল।

কোন্ বাঙালী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড করেন ?

প্রফুল্ল ঘোষ। ঐ অবস্থায় ৬১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সাঁতার কাটেন।

ইংলিশ-চ্যানেল সাঁতারে পার হওয়ায় কোন্ কোন্ বাঙালী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ?

নীতিন্দ্রনাথ রায়। ইনি ডোভার হইতে ১০ ঘণ্টা ১১ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) ব্রজেন দাস ১০ ১৫ মিনিটে পার হন ফ্রান্স হইতে ইংলিশ চ্যানেল। ব্রজেন দাস ১২ দিনে ছয় বার ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া বিশ্বরেকর্ড করেন।

দীর্ঘ সন্তরণে রেকর্ড করিয়াছেন কে ?

বাংলার সাঁতারু ব্যারিস্টার মিহির সেন। তিনি ইংলিশ চ্যানেল, পক প্রণালী, দার্দানলিশ, বসফোরাস প্রণালী এবং পানামা খাল অতিক্রম

(শেষাংস দশম পৃষ্ঠায়)

[আগে ঘা ঘটেছে :

বিপ্লবদের পুরোন বাড়ির কোথাও সোনার মোহর লুকোনো আছে। বাড়ি কিনতে এসে একজন আততায়ীর গুলিতে নিহত হ'ল। রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় একজন বিপ্লবের মা রত্নাদেবীকে ভয় দেখিয়ে মৃতদেহ পাচার করে দিল। থানার ও. সি. কিরণ লাহিড়ী তদন্তে এসে রত্নাদেবীর আলমারির ড্রয়ার থেকে রত্নাদেবীর ভাই পরেশের হারিয়ে যাওয়া রিভলবার খুঁজে পেলেন। ও সি কিরণ লাহিড়ী বিপ্লবদের সন্দেহ করছেন। বিপ্লব প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিরূপাক্ষ সেনকে নিয়ে এল। কাছের পার্কে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বিপ্লব ও রত্নাদেবী মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য কিরণ লাহিড়ীর সঙ্গে যেতে ইতস্তত: করছে।]

৭

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বিরূপাক্ষের কথায় রত্না দেবী ওর মুখের দিকে তাকালেন।

ভয়ের কি আছে এতে মা—বিরূপাক্ষ সেন বললে। তাছাড়া চলুন না থানায় গিয়ে দেখাই যাক—যে ডেড্‌বডিটা আপনার এখান থেকে কাল রাত্রে সরিয়ে ফেলেছিল এটা সেইটাই কি না।

রত্নাদেবী বললেন, যাবো বলছেন।

হ্যাঁ—চলুন।

কিন্তু বাড়ি খালি রেখে—

তালা দিয়ে চলুন সবাই। ভাল কথা মি: লাহিড়ী, কাল রাতে যে অ্যাটাচী কেসটা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে কি ছিল।

এক লাখ টাকার কারেন্সী নোট—একেবারে আনকরা বাণ্ডিল বাঁধা নোট।

এক লাখ টাকাই ছিল—বেশী কম নয়।

না। পুরো এক লাখ!

আপনি যে কাগজটা এদের দিয়ে কাল রাত্রে সই করিয়ে নিয়ে গিয়েছেলেন তার মধ্যে ঐ লাখটাকার কথা আছেত।

হ্যাঁ—পিস্তল আর লাখ টাকা।

ঠিক আছে চলুন—

দরজায় তালা লাগিয়ে সকলে থানার উদ্দেশে বের হলে।

বিপ্লবদের বাড়ি থেকে থানা বেশী দূরে নয়, হাঁটা পথে মিনিট ২০।২৫।

কিন্তু কিরণ লাহিড়ী সরকারী জিপ এনেছিলেন—তাতেই সকলে উঠে বসল।

জীপ পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে গেল থানায়!

কিরণ লাহিড়ী সকলকে নিয়ে অফিস ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঘরের মেঝেতে একটা স্ট্রেচারের পরে চাদর ঢাকা একটা বডি ছিল কিরণ লাহিড়ীই হাত বাড়িয়ে চাদরটা টেনে তুললেন।

সেই গায়ে একটা বড় ঝুল গরম কোট লোকটার—কিন্তু রত্না দেবী যেন কেমন থমকে গেলেন। মাথায় লোকটার গত রাতের টুপিটা নেই বটে—আরো আরো যেন কি নেই রত্নাদেবী মনে করবার চেষ্টা করেন—

কি হলো বৌদি, এ সেই লোকইত—

হ্যাঁ—মানে—

মানে! কিরণ লাহিড়ী রত্নাদেবীর মুখের দিকে তাকালেন।

লোকটার মুখে এক মুখ দাড়ি ছিল গত রাত্রে যে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু এ লোকটার মুখেত কোন দাড়ি দেখছি না।

সত্যিই লোকটার মুখে চাপ দাড়িত দূরের কথা একেবারে ক্লিন সেভড্। পরিচ্ছন্ন ভাবে দাড়ি কামানো।

লোকটার মুখে দাড়ি ছিল।

হ্যাঁ—আমার স্পষ্ট মনে আছে ঠাকুর পো রত্নাদেবী বললেন।

স্পষ্ট মনে আছে আপনার?

আছে বৈকি, অথচ

কি—

মনে হচ্ছে এ সেই লোক।—

বিরূপাক্ষ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবারে বললে, এমনওত হতে পারে কাল রাতে যখন লোকটা আপনাদের ওখানে গিয়েছিল ওর মুখে ফলস (নকল) দাড়ি লাগানো ছিল।

নকল দাড়ি। রত্না দেবী তাকালেন বিরূপাক্ষের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, হয়ত লোকটা ছদ্মবেশ ধারণের জন্য মুখে নকল দাড়ি লাগিয়েছিল।

কিরণ লাহিড়ী বললেন, সম্ভব নয় কিন্তু—

তবে এই লোকটাই যে সেই লোক সেরকমই আপনার মনে হচ্ছে তাই না মা, বিরূপাক্ষ আবার প্রশ্ন করে।—হ্যাঁ সেইরকমই মনে হচ্ছে।

আচ্ছা মা লোকটার মুখের দিকে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখুনত লোকটাকে আগে কখনো কোথায়ও দেখেছেন কিনা, মানে লোকটা আপনার কোন পূর্ব পরিচিত বা লোকটার সঙ্গে কোন আপনার পরিচিত লোকের সঙ্গে চেহারার কোনরকম মিল আছে কিনা ভাল করে দেখুন—

রত্না দেবী অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। বিরূপাক্ষর কথায় তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছিল, লোকটার মুখের সঙ্গে কোথায় যেন কারো একটা মুখের সঙ্গে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনে কি ভেবে তা প্রকাশ করলেন না, কে জানে এখানে বেফাঁস কিছু একটা বলে একটা নতুন কোন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন কিনা। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন রত্নাদেবী, বললেন না কারো সঙ্গে কোন মিল আছে বলে মনে হচ্ছেনা। আর একবার ভাল করে দেখুন মা বিরূপাক্ষ বলল।

না। ঐ মুখ কখনো পূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী ওর জামার পকেট সার্চ করেছিলেন।

করেছি, একটা কাগজ ভাজ করা ছিল একটি খামের মধ্যে, আর একটা চামড়ার পার্স ছিল। পার্সের মধ্যে শ তিনেক টাকা ও একটা এয়ারটিকিটের কাউন্টার পার্ট পাওয়া গিয়েছে।

এয়ারটিকিট কোথাকার ?

গৌহাটি টু কলকাতা।

টিকিটের মধ্যে যাত্রীর নাম ছিল নিশ্চয়ই। কি নাম ?

বিশ্বনাথ সিং।

বিশ্বনাথ সিং ? বিরূপাক্ষ তাকান লাহিড়ীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—

লোকটা কি আসাম বলে মনে হয় আপনার মিঃ লাহিড়ী।

বাঙালী বলেই মনে হয়—

তাই হবে এবং আমার মনে হচ্ছে ওটাও একটা ফলস্ বা ছদ্ম নাম।

যানে।

লোকটার নাম ওটা আদউ নয়, বিরূপাক্ষ বললে, আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়। যাক গিয়ে আপনার কাজত শেষ হয়েছে, এবার বোধহয় ওরা ফিরে যেতে পারেন—

হ্যাঁ।

কিছু লিখিয়ে নেবেন।

না এখন কিছুর প্রয়োজন নেই।

চলুন মা—চল বিপ্লব—

বিরূপাক্ষ ওদের দুজনকে নিয়ে বের হয়ে এলো। এবং বের হয়েই হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ওদের বিরূপাক্ষ বললে আপনারা এগোন মা আমি আসছি, আমি এখান থেকে আপনাদের ওখানেই যাবো।

রত্না দেবী ও বিপ্লব এগুল।

বিরূপাক্ষ আবার থানায় এসে ঢুকল, বড় বাবুর অফিস ঘরে।

কিরণ লাহিড়ী চেয়ারে বসেছিলেন।

বিরূপাক্ষ ঘরে ঢুকে ডাকল, মিঃ লাহিড়ী।

কে ? ও আপনি কিছু বলবেন মিঃ সেন।

হ্যাঁ যে কাগজটা মৃত দেহের পকেটে পাওয়া গেছে সেটা একবার দেখতে পারি—

হ্যাঁ বসুন না দেখাচ্ছি—

কিরণ লাহিড়ী একটা ফাইল খুলে তার ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করলেন, বললেন নিন—

হাতে নিল কাগজটা বিরূপাক্ষ।

একটা চিঠি—

ইংরেজীতে লেখা চিঠিটা। সংক্ষিপ্ত চিঠি। অসংখ্য ভুলে ভরা। উপরে চিঠিতে কাউকে কোন সম্বোধন নেই আছে লেখা রত্নেশ্বর, চিঠির মর্মার্থ হচ্ছে....

কাজ যদি হাসিল করতে পারো নগদ এক লাখ টাকা পাবে—রত্নেশ্বর।

কোন এক রত্নেশ্বর কাউকে চিঠিটা লিখেছিল—

সম্ভবতঃ ঐ মৃত ব্যক্তিই রত্নেশ্বর।

রত্নেশ্বর, রত্নেশ্বর।

হঠাৎ, হঠাৎই একটা কথা বিদ্যুৎ চমকের মত বিরূপাক্ষর মনে উদয় হয়।

ঐ রত্নেশ্বর, রাজেশ্বরের বংশের কেউ নয়ত।

কি ভাবছেন মিঃ সেন। কিরণ লাহিড়ীও বলেন।

কিছু না আচ্ছা চলি।

এদিকে কিছুটা পথ গিয়েছেন রত্না ছেলেকে নিয়ে, একটা জীপ এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

একজন বাঙালী ড্রাইভার—

মাইজী সেন সাহেব জীপ পাঠালেন। আপনাদের এক্ষুনি একবার থানায় যেতে বলেছেন। রত্না দেবী ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

ছেলে বললে, চল মা কেন আবার বিরূপাক্ষ বাবু ডাকছেন, ওঠো জীপে।

দু'জনে জীপে ওঠে বসে।

সঙ্গে সঙ্গে জীপটা উল্টো পথ চলতে শুরু করে।

বিপ্লব বলে, কোথায় যাচ্ছ, থানাত ও দিকে নয়।

চুপচাপ বসে থাকো, ড্রাইভার বললে, চেচাবে কি গুলি করবো।

বিপ্লব দেখলে, তার হাতে একটা পিস্তল।

পিস্তলটার লক্ষ্য ওরাই।

মা ও ছেলে।

(চলবে)

মনে রেখো (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করিয়া ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এশিয়ার মহিলাদিগের মধ্যে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন কে?

আরতি সাহা ১৯৫৯ সালে।

গ্রাঁ প্রী (Grand Prix) প্রতিযোগিতা কি? কোন্ খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন?

টেনিস খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এই খেলায় (সিংগলসে) বিজয় অমৃতরাজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ১৯৭৩ সালে দিল্লীতে তিনি প্রথম চ্যাম্পিয়ান হইয়াছিলেন। (ডাবলসে) বিজয়ী—ওয়ানটেস ও গিসবার্ট। বিজিত—বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ।

জগদ্বিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্সার কে?

লুইসভিলের ক্যাসিয়াস ক্লে নামে এক নিগ্রো যুবক। ইনি ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়া "মহম্মদ আলি" নামে পরিচিত হন।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কে?

রুডি হাতোনা। ১৯৪৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়ার জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বৎসর ধরিয়া বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।

মার্ক টোয়েনের

হ্যাকেলবেরি ফিন্

—রূপান্তর—

প্রভাস মল্লিক

মার্ক টোয়েন ঃ

[জন্ম ৩০শে নভেম্বর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রদেশে। তাঁর আসল নাম, স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স। শৈশব কেটেছিল তাঁর মিসিসিপি নদীর তীরে তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনবদ্য পরিবেশে। তাই তাঁর এই নদীর ওপর ছিল প্রবল আকর্ষণ। তাঁর ছদ্ম নাম নেবার পেছনে তাঁর নদীর ওপর অগাধ টান প্রকাশ পায়। 'মার্ক টোয়েন' কথার অর্থ দুই ফ্যাদম গভীরতা। নদীপথে যেতে ষ্টীমারে যে নাবিক জল মেপে মেপে যায়, যখন দুই ফ্যাদম জল কমতে কমতে এসে পৌঁছায়, তখন সে হেঁকে ওঠে 'মার্ক টোয়েন' অর্থাৎ দুই মার্কা, স্টীমারকে অন্য পথে ঘুরে যাবার নির্দেশ দিয়ে। এই কথাটা ক্লিমেন্সের এত ভাল লাগে যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ছদ্ম নাম ধরে তিনি লেখনী ধরেন। "অ্যাডভেঞ্চারস অফ টম স্যইয়ার" "হাকেলবেরি ফিন্" এই দুই পুস্তক তাঁর শৈশবের নদীর ওপর খেলা, আনন্দ ও দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী নিজের অভিজ্ঞতার ওপর লেখা। তিনি মিসিসিপি নদীর স্টীমারের পাইলট হিসাবে জীবনে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুন এই স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়াতে তিনি কার্সন সিটিতে এক কাগজের রিপোর্টার হিসাবে যোগ

দেয়। অবশ্য মাত্র বার বছর বয়সে তাঁর পিতৃ বিয়োগের পর থেকে তিনি তাঁর বড় ভাই-এর খবরের কাগজে খুঁটি-নাটি কাজ শিখতে থাকেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গল্প "সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব ক্যালাভেরাজ্" তাঁকে রাতারাতি প্রসিদ্ধ করে তোলে। তারপরই তিনি লেখেন 'ইনোসেন্টস অ্যাব্রড।' তাঁর সাংবাদিকতা এবং বই লেখা এক সঙ্গে চলতে থাকে ও তার লেখনী থেকে বেরুতে থাকে একটার পর একটা পুস্তক যা বিশ্ব সাহিত্যে চিরন্তন সম্পদ হয়ে আছে।

'জাম্পিং ফ্রগ' ছাড়া তাঁর শ্লেষাত্মক কাহিনী 'ক্যানেক্টিকাট ইয়াংকি ইন্ কিং আর্থার্স কোর্ট, প্রিন্স এণ্ড পপার' প্রভৃতি পুস্তক পর পর প্রকাশিত হয়ে তাঁকে যশস্বী করে তোলে।

কৌতুক রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই লেখকের মৃত্যু হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে।]

(১) হ্যাক্ ডাকাতের দলে যোগ দিল ঃ

তোমরা যদি "টম সইয়ারের দুঃসাহসিক অভিযানে"র গল্প না পড়ে থাক তবে সম্ভবতঃ আমার নাম শোননি। তবে কিছু যায় আসেনা, এবার আমি আমার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী তোমাদের বলব। আমার নাম হ্যাকলবেরি ফিন্, অবশ্য আমার বন্ধুরা আমাকে হ্যাক্ বলেই ডাকে। আমার মা, ভাই, বোন কেউ নেই। বাবা আছেন বটে তবে তিনি অনেক দিন আমার খবর নেবার প্রয়োজন মনে করেননি, বেশীর ভাগ সময়ই মাতাল হয়ে কোথায় পড়ে থাকেন কেউ জানে না। আমি মিসেস ডগলাস নামে এক বিধবা ভদ্রমহিলার আশ্রয়ে বাস করি। তিনি খুব স্নেহময়ী, কিন্তু নিয়ম-নিষ্ঠার অভাব হলেই তিনি কঠোর হয়ে যান।

একদিন মিসেস ডগলাসের উপদেশের পর উপদেশ আর তাঁর আমাকে ভদ্র করার প্রচেষ্টা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলে আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই, কিন্তু টম্ সইয়ার আমাকে খুঁজে বার করে ও বলে আমি যদি ফিরে যাই তা হলে সে আমাকে তার নতুন ডাকাতের দলে নেবে। অগত্যা আমি ফিরে আসি।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি আমার ওপরের ঘরে উঠে এলাম। সারাদিন স্কুলে পড়া না পারার জন্য মাস্টার-মশাইদের তিরস্কার তারপর বাড়ি এসে মিসেস ডগলাসের বোন মিস্ ওয়াটসনের এক প্রস্থ ভৎর্সনা, খুব মনমরা হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছি। ঘুম আসছে না। জানালার ভেতর দিয়ে দেখি তারাগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বাড়ি নিস্তব্ধ। দূরে জঙ্গলে ঝরা পাতার ঝির ঝিরে আওয়াজ কানে আসছে। হঠাৎ একটা পেঁচা ডেকে উঠলো। বাইরে একটা টাওয়ার ক্লকে বারটা বাজার ঘন্টা পড়ল। তারপর কোথায় যেন গাছের ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ শুনে আমি কান খাড়া করে শুয়ে আছি। কানে এল 'মিঁ-য়াও', 'মিঁ-য়াও'। খুব আস্তে আস্তে আমি উত্তর দিলাম, 'মিঁ-য়াও' মিঁ-য়াও'। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আলো নিভিয়ে জানালা দিয়ে পড়লাম গোয়ালের চালের ওপর আর সেখান থেকে এক লাফে বাগানের ঘাসের ওপর। যা আশা করছিলাম একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, টম সইয়ার।

মিসেস ডগলাসের বাগানের পেছনের পথ দিয়ে আমরা অতি সন্তর্পণে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ একটা গাছের শেকড়ে পা লাগায় আমি পড়ে গেলাম। জোর একটা আওয়াজ হল। মিস ওয়াটসনের নিগ্রো-ক্রীতদাস জিম, বিরাট বপু নিয়ে তখন জেগে বসেছিল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো "কে? কে ওখানে?"

আমরা চকিতে দুটো ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসে পড়লাম। সে এগিয়ে এসে আমাদের দেখতে না পেয়ে বলতে লাগলো, "কে তোমরা? কোনখানে লুকিয়েছ? আচ্ছা আমি এখানে বসলাম, দেখি কোথায় যাও।"

একটা গাছে ঠেলান দিয়ে ও বসে রইলো। আমরা বিপদে পড়লাম। আমার সারা শরীর চুলকাতে লাগলো, তবু সাহস করে চুলকাতে পারছিনা, যদি শব্দ হয়। কানে এল জিমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, তারপরই তার নাক ডাকার শব্দ শুনে আমরা বেরিয়ে এসে বাঁচলাম। টম জিমের সঙ্গে একটু মজা করতে চাইল। জিমের টুপিটা তার মাথা থেকে খুব সন্তর্পণে খুলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। জিমের ভূতে ও ডাইনীতে খুব ভয়। ঘুম থেকে

উঠে, গাছে টুপি দেখে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে যাবে।

আমরা ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌছুলাম। সেখান থেকে নীচে নিঝুম গ্রাম, ওপরে তারাভরা আকাশ, আর গ্রামের কোল ঘেসে বিরাট নদী অবিশ্রান্ত অবিরল বয়ে চলেছে। নীচে নামতেই আমাদের বন্ধুরা এদিক ওদিক থেকে এসে জড়ো হল। টমের নির্দেশে নদীর ধারে গিয়ে একটা নৌকায় চেপে বসলাম। উজানে দাঁড় বেয়ে প্রায় দু-মাইল যাবার পর একটা ঘন ঝোপ দেখে আমরা নেমে পড়লাম। একটা বড় ঝোপের মধ্যে দেখি একটা গর্ত নীচের দিকে নেমে গেছে। খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে যাবার পর দেখি গুহাটা চওড়া হয়ে গেছে। একটা জায়গা বেছে, সঙ্গে আনা মোমবাতি জালিয়ে আমাদের প্রথম সভা বসলো।

টম বল্লে "এই যে ডাকাতের দল আমরা গঠন করতে চলেছি, এর নাম হবে, "টম সুইয়ারের দল।" যারা সভ্য হবে তাদের শপথ নিতে হবে ও নিজের রক্ত দিয়ে এই কাগজে সই করতে হবে।"

সবাই আমরা সম্মতি জানালাম। টম পকেট থেকে আর একটা কাগজ বার করলে, সেটাতে লেখা আছে শপথ বাক্য। এতে হুকুম জারি করা আছে যে প্রত্যেকে শপথ করবে যে, সে এই দলের আনুগত্য স্বীকার করবে। যদি কোন সভ্য দলের কোন কথা ফাঁস করে ফেলে তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হবে—তার গলা কেটে ফেলা হবে ও তার নাম সভ্যের তালিকা থেকে রক্ত দিয়ে কেটে দেওয়া হবে।

প্রত্যেকের মতে এ একটা অপূর্ব শপথ পাঠ। একজন সভ্য বিল রজার্স প্রশ্ন করল, "আমাদের দলের কর্মসূচী কি হবে?"

"শুধু ডাকাতি আর খুন," টম জোর দিয়ে বলে উঠলো। অন্য একজন সভ্য জো হারপার বল্লে "আমরা কাদের ওপর ডাকাতি করব? বাড়ি ঘর, গরু ভেড়া, না—"

"রাবিশ! গরু ভেড়া চুরি! আমরা পথের দস্যু। মুখোশ পরে পথের গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা ডাকাতি করব। আরোহীদের দড়ি বেঁধে দরকার হলে হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করব।" টম বলে উঠল।

আবার এইখানে মাঝে মাঝে মিলিত হব, এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সবাই গ্রামে ফিরে চল্লাম। সে রাত্রে যখন বিছানায় আশ্রয় নিলাম তখন আমি ভীষণ শ্রান্ত।

তারপর গুহার মধ্যে আমরা কয়েক বারই মিলিত হলাম বটে তবে কোন ডাকাতিই হল না বা কেউ খুনও হলনা। পরের মাসে আমায় পদত্যাগ পত্র পেশ করতে দেখে সবাই তাই করলে।

(২) হ্যাকের বাবা আবার দেখা দিল

তারপর তিনমাস কেটে গেছে। শীত এসেছে। এখন স্কুলে যেতে আমার বেশ ভালই লাগে। আমার বাবা, যাঁকে আমি "প্যাপ" বলে ডাকি তিনি আমার স্কুলে যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না, তিনি চাইতেন না আমি লেখাপড়া শিখি। শুধু শুধু বসে থাকা আর কারণে অকারণে প্যাপের হাতে বকুনি ও মার খাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল।

মিস্ ওয়াটসন একদিন খাবার টেবিলে আমাকে আদব কায়দা শেখাচ্ছেন, হঠাৎ আমার হাতে লেগে লবণের পাত্রটা পড়ে গেল। এটা খারাপ লক্ষণ। তখন মন বলছিল সামনে খারাপ সময় আসছে। কোন কাজে মন বসল না। বাগানের বেড়া টপকে ওপারে পড়েই দেখি বরফের ওপর কার পায়ের চিহ্ন। চিহ্নটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি বাঁ পায়ের গোড়ালিতে একটা ক্রশ চিহ্ন—দুটো পেরেক দিয়ে এই ক্রশের আকার ধারণ করেছে। শুনেছিলাম শয়তানকে দূরে রাখার জন্য এই চিহ্ন ধারণ করা হয়।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঢালু পথে নামতে নামতে গিয়ে থামলাম জজ থ্যাচারের বাড়ির গেটের সামনে।

তোমরা যারা 'টম স্যুইয়ারের দুঃসাহসিক' গল্প পড়েছ তারা অবশ্যই জান আমি ও টম কোন ডাকাতের দলের লুকিয়ে রাখা বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করি। আমার ভাগের ছ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা জজ থ্যাচার ব্যাঙ্কে জমা করে দেন আমার হয়ে আর সেই টাকার সুদ হিসাবে রোজ আমায় এক ডলার করে দিতেন। আমাকে অমন ভাবে দৌড়ে আসতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যালো হাক্ কি ব্যাপার! টাকার দরকার—

"না মহাশয় ও টাকা আমার আর দরকার নেই, ওটা আপনি রেখে দিন।"

"কিন্তু কেন?" তাঁর চোখে বিস্ময়।

"সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না।"

তিনি কি ভাবলেন তারপর ঘরে গিয়ে একটা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে এসে, একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে আমায় সই করতে বল্লেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি সই করে তার দিকে তাকালে, তিনি বল্লেন, "উপস্থিত সময়ের জন্য টাকাটা আমার কাছে রইল।" তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নেবার সময় তিনি আমার হাতে একটা ডলার গুঁজে দিলেন।

আমি ফিরেই মিস্ ওয়াটসনের ক্রীতদাস জিমের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম সে আমার বাবার খবর কিছু বলতে পারে কিনা। কারণ আমি জানতাম ঐ পায়ের চিহ্ন আর কারুর নয় আমার বাবার। কিন্তু জিম কিছু বলতে পারলে না।

সেই রাত্রে যখন ঘরে এসে আমি মোমবাতি জ্বালালাম দেখি অন্ধকারে একটা চেয়ারে প্যাপ্ বসে আছে। জানালাটা খোলা দেখেই বুঝলাম গোয়াল ঘরের চালের ওপর দিয়ে জানালা বেয়ে প্যাপ ঘরে ঢুকেছে। তিনি আমাকে ভীষণ মারতেন তাই তাঁকে দেখলেই আমার ভয় হত। আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, মুখটা ফ্যাকাসে, গোঁফ ও জুলফি একেবারে সাদা। পরনে জামা শত ছিন্ন। আমি তাঁর দিকে যেতে চোখ সরিয়ে নিইনি। আমার জামা কাপড়, বিছানা, দেওয়ালে টাঙানো আয়না সব দেখে বল্লেন,

"নতুন জামা, আনকোরা নতুন, নরম বিছানা—একটা কেউ কেটা নিজেকে মনে করছিস, তাই না?' আমি চুপ করে আছি।

"হুঃ ওরা বলছিল তুই লিখতে পড়তে পারিস, তোর বাবার চেয়ে অনেক বেশী জানিস। আচ্ছা তোর পড়াশুনা পাটে তুলছি শীঘ্রি।"

তারপর কিছুক্ষণ অযথা আমাকে গালাগালি দিয়ে, আমার পকেট থেকে জজ থ্যাচারের দেওয়া ডলারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পরের দিন পুরো মাতাল অবস্থায় তাঁকে দেখা গেল। জজ থ্যাচারের কাছ থেকে আমার ছ হাজার ডলার আদায় করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল হল কারণ আগের দিনই আমি সই করে টাকাটা জজকে লিখে দি। পরে তিনি কোর্টের শরণাপন্ন হলেন আমাকে ফিরে পাবার জন্য। যেহেতু তিনি এখনও আমার পিতা তাই জজ থ্যাচার ও মিসেস ডগলাস কিছু করতে পারলেন না। আমার ওপর তাঁর অধিকার স্বীকৃত হল বটে তবে আমি মোটেই সুখী হলাম না। আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম, কিন্তু একদিন তিনি আমাকে ধরে ফেল্লেন ও

নিয়ে গিয়ে তুলেন তাঁর নৌকাতে। তারপর নৌকায় করে বেশ খানিকটা গিয়ে ঘন জঙ্গলে একটা কাঠের কেবিনে নিয়ে তুলেন আমায়।

এখানে আমায় এমন চোখে চোখে রাখতেন যে আমার পালিয়ে যাবার কোন সুযোগই ছিল না। কোথাও গেলে আমাকে কেবিনের মধ্যে তালা লাগিয়ে যেতেন। বুনো শূকর ও মাছ, তাই খেয়েই আমরা চালাতে লাগলাম। এসে এই অলস জীবন আমার ভালই লাগতে লাগলো; নেই স্কুলের তাড়া, নেই মিস ওয়াটসনের কঠিন বিধি নিষেধ। তবে মাঝে মাঝে প্যাপ কোথায় চলে যেতেন এক নাগাড়ে তিন চার দিনের ওপর। আমি সেই বন্ধ কেবিনে পড়ে থাকতাম একা। প্যাপ যখনই ফিরতেন তখনই আমার ওপর তাঁর প্রহারের মাত্রা বেড়ে যেত কারণ তিনি কখনও স্বাভাবিক থাকতেন না। আমার সারা দেহে কালশিরা পড়ে গিয়েছিল, আর এ অবস্থায় থাকতে আমার ঘৃণা বোধ হতে লাগলো। এখানে থেকে কি করে পালানো যায় সেই আমার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো দিন রাত্রি। কেবিন থেকে নিজেকে মুক্ত করব, এমন কোন জিনিসই থাকত না কেবিনে। একদিন এই অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখার মতো চোখে পড়ে গেল একটা হাতল ভাঙা করাত, ওপরে একটা বরগার পেছনে পড়ে আছে।

প্যাপ একদিন যেমনি নৌকা করে সহরের দিকে গেছেন আমি ঐ হাতল ছাড়া করাত দিয়েই কেবিনের এককোণে কাঠের দেওয়ালের কাঠ কেটে চল্লাম।

সে রাত্রে প্যাপ টলতে টলতে কেবিনে প্রবেশ করেই তক্তার ওপর শুয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছেন আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন। আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা, একটা বীভৎস আর্তনাদ কানে যাওয়ায় ভয়ে উঠে পড়ে দেখি প্যাপ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চারিদিকে পা ছুড়ছেন আর বলছেন, "সাপ! সাপ! আমার পা বেয়ে উঠছে, ফেলে দাও।" কিছুক্ষণ এই রকম নাচন কোদনের পর পড়ে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার বিড় বিড় করে বলছেন, "ওই ভবঘুরেটা আমার পেছু নিয়েছে।" হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই একটা ছুরি নিয়ে আমাকে তাড়া করলেন, বলতে বলতে "এই তো মৃত্যুর দূত, একে সাবাড় করে—"আমি মিনতি করে বলছি, "প্যাপ আমি হাক। হাক!" কিন্তু সে কথা শুনে বীভৎস হাসি হেসে আমাকে ধরে ফেল্লেন। তার ছুরিটা আমার জ্যাকেটের ভেতর বসিয়ে দিয়ে ছিলেন আর কি! আমি কোনক্রমে ফসকে বেরিয়ে এলাম। তিনিও মাটিতে পড়ে গিয়ে সম্ভবতঃ জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লেন। এ রকম মত্ত অবস্থায় আগে আর তাকে কখন দেখিনি। আমি তার বন্দুকটা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম আবার কোন আক্রমণের ভয়ে।

আমি বন্দুক হাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, প্যাপের চিৎকারে জেগে উঠলাম। "তুই বন্দুক হাতে কি করছিলি?" আমি তাড়াতাড়ি বল্লাম, "কে যেন রাত্রে কেবিনে ঢোকবার চেষ্টা করছিল, আমি আপনাকে ওঠাবার চেষ্টা করি কিন্তু আপনি নড়লেনই না তাই—।" "আচ্ছা,

উঠে খাবার ব্যবস্থা কর," এই বলে নদীতে মাছ ধরবার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

সারা দিন কাটলো মাছ ধরা আর নদীতে ভেসে আসা কাঠের তক্তাগুলোকে সাঁতরে পাড়ে আনতে। খাওয়া দাওয়ার পর প্যাপ ঘুমিয়ে পড়লে আমি নদীর পাড়ে বসে বসে প্রবল স্রোতে ভেসে আসা তক্তা ও গাছ পালা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দূরে যেন দেখলাম একটা বড় গোছের 'ক্যানো', রেড ইণ্ডিয়ানদের নৌকা, ভেসে আসছে। অনেক সময়ে কেউ না কেউ খোলের মধ্যে লুকিয়ে শুয়ে থাকে লোকদের বোকা বানাবার জন্য। প্রথমটা ইতস্ততঃ করে পরে সাঁতরে গিয়ে দেখি এটা খালি। দাঁড় বেয়ে সেটা পাড়ে নিয়ে এসে ডালপাতা দিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আমার কাছে উপস্থিত।

(৩) হ্যাক্ পালাল

ঘুম থেকে উঠেই দেখি প্যাপ কোথাও যাবার তোড়জোড় করছেন। সকালের একটা ভেসে আসা ভেলা যা ধরা হয়েছিল সেটা বেচতে তিনি সহরের দিকে চল্লেন। আমাকে তাঁরা লাগাতে ভুললেন না। বুঝতে বাকি রইল না তিনি আর রাত্রে ফিরছেন না। আমার পালাবার মস্ত সুযোগ উপস্থিত।

প্যাপের নৌকো তখনও চোখের বাইরে যায়নি, আমি গর্ত গলিয়ে বেরিয়ে এলাম কেবিন থেকে। কেবিনে যা কিছু দরকারী জিনিস ছিল একে একে সব ক্যানোর মধ্যে তুলতে লাগলাম। যখন আর বিশেষ কিছু তোলবার রইল না তখন গর্তটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। তারপর একটা কুড়াল নিয়ে কেবিনের দরজাটা ভেঙে কেবিনের যা অবশিষ্ট ছিল কুড়ালের আঘাতে ভেঙে তচ নচ্ করে দিলাম। বন্দুক নিয়ে বেরিয়েই একটা বুনো শূকর চোখে পড়ে গেল। সেটা মেরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম কেবিনে। টেবিলের ওপরে তুলে ওটার গলা কেটে দিতেই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত কেবিনের চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ল। আমি আমার চুলের গোছার খানিকটা কেটে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে কুড়ালের ফলকটার ওপর ফেলে রাখলাম। তারপর মরা শূকরটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম নদীর জলে। সব কাজ নিখুঁতভাবে সেরে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। এখন সবাই ভাববে আমাকে খুন করে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে কেউ।

আমি 'ক্যানো' ছেড়ে দিলাম দূরের ঐ দ্বীপটার উদ্দেশে। ঐ দ্বীপটাকে সবাই বলে, 'জ্যাকসান দ্বীপ', ওখানে কেউ আমায় খুঁজতে যাবে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যদি কেউ খুঁজতেই যায় তবে কালই সকালের আগে ত নয়ই। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, দ্বীপে পৌঁছেই আমার চোখে নেমে এল গাঢ় ঘুম।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো তখন সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে। হঠাৎ 'বুম' 'বুম' করে শব্দ কানে ভেসে এল। দূরে চোখে পড়ল একটা ফেরিবোট নদী পেরিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। ফেরি বোটের পাশ দিয়ে সাদা ধোঁয়া ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না এরা আমার খোঁজে বেরিয়েছে। জলের ভেতর কামান দাগছে, যাতে আমার দেহ ভেসে ওঠে। আরও একটু কাছে আসতে দেখতে পেলাম ফেরি বোটের ওপর দাঁড়িয়ে মিস্ ওয়াটসন, জজ থ্যাচার, প্যাপ, টম সইয়ার আরও অনেকে। ওরা যখন দ্বীপের আরও কাছে এসেছে তখন তারা আমার খুনের ব্যাপারে আলোচনা করছে, তা আমার কানে এল। আমি যে স্বশরীরে বেঁচে আছি ও মনের স্ফূর্তিতে আছি ওরা কেউ জানতে পারল না।

সারা দিনটা কেটে গেল একটা তাঁবু খাটাবার সুবিধেমত জায়গা দেখতে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে আকাশ ভরা তারা দেখতে লাগলাম মুখে একটা পাইপ ধরিয়ে। এখন আমি স্বাধীন—সত্যি স্বাধীনতায় কত আনন্দ!

পরের দিন দ্বীপটা পর্যবেক্ষণ করতে বেরুলাম বন্দুক নিয়ে। পাহাড়ের নীচে, দুটো পাথর দিয়ে একটা উনান তা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে দেখে, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কে থাকতে পারে এই দ্বীপে! তবে কি কেউ আমার খোঁজে এখানে এসেছে আমি খুব ভয় পেয়ে

গেলাম। কে এখানে থাকতে পারে দেখা দরকার। খুব সন্তর্পণে বন্দুক হাতে জঙ্গল পেরিয়ে খোলা মাঠে এসে পড়লাম। মাঠের ওপারে দেখি একটা লোক কম্বল ঢাকা দিয়ে আগুনের পাশে বসে। লোকটা আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখি সে আর কেউ নয় মিস ওয়াটসনের নিগ্রো ক্রীতদাস জিম্—আমার বিস্ময়ের আর শেষ নেই, সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না, চেঁচিয়ে বল্লাম, "হ্যালো জিম!" আমাকে ওর দিকে দৌড়ে যেতে দেখে ও লাফিয়ে উঠলো পায়ে পায়ে পেছিয়ে যেতে লাগল। খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। আস্তে আস্তে বল্লে, "আমার কোন ক্ষতি কর না। আমি মৃত লোককে খুব সম্মান করি। তুমি দয়া করে নদীতে চলে যাও, ওখানেই তোমার স্থান।" আমি যে ভূত নই তা ওকে বোঝাতে বিশেষ কষ্ট হল না। ও যখন পালিয়ে আসে ঠিক সেই সময়ই আমার খুন হবার খবর সহরে রটে যায়, তাই নাকি সবাই ওকে আমার খুনী বলে সন্দেহ করছে, জিম জানালে। আমি ওকে আশ্বাস দিলাম যে কাউকে আমি তার এখানে আসার কথা বলব না। এর পর থেকে আমরা দুজনে এক সঙ্গে থাকব এই প্রস্তাব সে সানন্দে গ্রহণ করলো।

এ দ্বীপ লম্বায় প্রায় তিন মাইল ও চওড়ায় সিকি মাইল। দ্বীপের মাঝামাঝি এক পাহাড়ের বড় গুহা দেখে সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের দিন বেশ আনন্দে কাটতে লাগল—মাছ ধরতাম, সাঁতার কাটতাম, ফাঁদ পেতে জন্তু ধরতাম। একদিন একটা বড় ভেলা ভেসে যেতে দেখে সাঁতার কেটে টেনে নিয়ে এলাম পাড়ে। ভবিষ্যতে এটা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

এক দিন সন্ধ্যায় দুজনে বসে বসে পাইপ টানছি, হঠাৎ জিম বলে উঠলো "হ্যাক, দেখ, মনে হয় এক বজরা ঐ দূরে কাত হয়ে আটকে আছে।" আমরা ক্যানোয় করে বজরাতে গিয়ে উঠলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, ভোরের আলো ফুটলে দেখি সব ভাঙ্গা চোরা জিনিস এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটি ঘরে এক মৃতদেহ পড়ে। আমি দেখার আগেই জিম লোকটার মুখ ঢাকা দিয়ে বল্লে, "বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।" চারিদিকে হুইসকির ভাঙ্গা বোতল ও ছেঁড়া খেলার তাস। অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন লণ্ঠন, একটা বড় ছুরি, মোমবাতি ওষুধ পত্তর আমি একে একে ক্যানোয় তুলাম।

একদিন দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে একটা ময়া সাপ চোখে পড়ায় জিম বল্লে, এটা অশুভ লক্ষণ। ওর মন কুসংস্কারে ভরা। সত্যি রাত্রে ওকে এক সাপে কামড়ালো। আমরা যা করবার করলাম কিন্তু জিম প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। পঞ্চম দিনে ও খানিকটা সুস্থ হয়ে পথ্য করল।

এরপর জিম বেশ সুস্থ হয়ে উঠলে আমি ওকে বল্লাম এখানে বড় এক ঘেয়েমি লাগছে সহরে কি হচ্ছে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। জিম প্রস্তাব করলে আমি যেন একটা মেয়ে সেজে রাত্রির অন্ধকারে যাই, না হলে লোকে আমাকে চিনে ফেলবে।

আমি বজরাতে পাওয়া একটা গাউন ছোট করে পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়ে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার দেখা পাই। তিনি ও তাঁর স্বামী নাকি এ সহরে ইদানিং এসেছেন বাস করতে। তাঁর কাছে জানতে পারি জিমকে ধরার জন্য তিনশ ডলার ও প্যাপকে ধরার জন্য দুশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমাকে খুন করার জন্য এ দুজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তারপর ভদ্রমহিলা যখন জানালেন তাঁর স্বামী দু এক দিনের মধ্যে কুকুর নিয়ে জ্যাকসান দ্বীপে জিমের সন্ধানে আসছেন তখন আমি কোন অজুহাতে পালিয়ে আসি। যত তাড়াতাড়ি পারি জ্যাকসান দ্বীপে দাঁড় বেয়ে ফিরে আসি ও জিমকে সব বলি। সেও খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো। আমরা সেই রাত্রেই এই দ্বীপ

ছেড়ে ভেলা করে পালিয়ে যাবার মনস্থ করলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা আমাদের যা কিছু ছিল ভেলায় চাপিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নদীর স্রোতে ভেলা ভাসিয়ে দিলাম। আমি ক্যানোয় করে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে এলাম কেউ আসছে কিনা, তখনও আমাদের আতঙ্ক যায়নি। না কোন নৌকায় দেখা নেই। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ শুধু নদীর প্রবল গর্জন। রাত্রি একটার সময় আমরা দ্বীপের শেষ প্রান্ত ছেড়ে এগিয়ে চল্লাম। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

(৪) ভাঙা জাহাজের ওপর

যখন দিনের প্রথম আলো দেখা দিল আমরা তীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভেলাটা নির্জন জায়গা দেখে লুকিয়ে রাখলাম। জঙ্গল থেকে কাঠ ও গাছের ডাল কেটে নিয়ে এল জিম। সারাদিন কাপাসের লেপে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে জিম ভেলাটার ওপর কাঠ দিয়ে একটা ছাউনি তৈরি করলে। এবার থেকে সূর্যের প্রখর তেজ ও বর্ষার হাত থেকে আমরা রেহাই পাব।

তারপর কয়েক রাত্রি ভেলা ভেসে চল্লো। উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ঘটল না তবে প্রত্যেক রাত্রি আমরা একটার পর একটা সহর পেরিয়ে যেতে লাগলাম। দিনের বেলা ভেলা লুকিয়ে রেখে রাত্রে আমরা এগিয়ে যেতাম। আমি লুকিয়ে কোন না কোন গ্রাম থেকে সস্তায় কিছু মাংস কিনে আনতাম। সুবিধে বুঝলে দু একটা মুরগী বা কারুর বাগান থেকে দুই একটা তরমুজ চুরি করতে ছাড়তাম না।

পঞ্চম রাত্রে আমরা একটা বড় সহর, সেণ্ট লুই পার হয়ে এলাম। সারি সারি আলো দেখাচ্ছিল অপূর্ব। ষষ্ঠ রাত্রে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়লাম। হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল একটা জাহাজ কাত হয়ে পড়ে আছে। নীচের ডেক সম্পূর্ণ জলের তলায়। জাহাজটার ওপর দেখে আসতে প্রথমে রাজি হয়নি জিম। পরে ভেলা জাহাজের পাশে ভিড়িয়ে ওপরে গিয়ে দেখি ক্যাপটেনের ঘরে আলো জলছে। আমি সেই ঘরে উঁকি মেরে দেখি একজন লোককে খুন করতে চলছে অন্য দুজন ডাকাত। স্রোতের টানে কখন আমাদের ভেলা ভেসে গেছে বুঝতে পারিনি। কপালক্রমে ডাকাতের জাহাজের গায়ে ভেড়ানো নৌকা করে পালিয়ে আসতে সক্ষম হই। জাহাজটা একটু পরে সম্পূর্ণ ডুবে যায় আর সম্ভবতঃ ডাকাতের দলের কেউই রক্ষা পায়নি। অনেক দূরে গিয়ে আমরা আমাদের ভেলাটা আটকে থাকতে দেখে সেখানে উঠে পড়ি। ডাকাতের নৌকায় প্রচুর জিনিস আমাদের ভেলায় তুলে ওদের নৌকাটা জলে ডুবিয়ে দিই।

হাক জিমকে বাঁচাল

ডাকাতের দলের ব্যাগের মধ্যে বুট জুতো কম্বল অনেক জামা কাপড় ছাড়া একটা দূরবীন, তিন বাক্স সিগার আরও অনেক জিনিস আমাদের ভাণ্ডারে সংযুক্ত হল। জঙ্গলে সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে রাত্রে আবার ভেলায় চড়ে এগিয়ে চল্লাম। আমরা হিসাব করে দেখলাম আর তিন রাত্রের মধ্যে আমাদের কাইরো সহরে পৌছানোর কথা। এখানে আমরা ভেলা বিক্রি করে ওয়াহোর দিকে চলে যাব। ওখানে পৌছালে জিম দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয় রাত্রে এত ভীষণ কুয়াশায় সব ঢেকে দিল যে পাড়ের দিকে ভেলা ভেড়াবার জন্য ক্যানোয় গুণ টেনে চলেছি। স্রোতের টানে দড়ি গেল ছিঁড়ে। জিম ভেলায় ভেসে চল্লো আমি ক্যানোয়, কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ কাউকে আর দেখতে পেলাম না। এত শ্রান্ত হয়ে পড়লাম যে আমি ক্যানোয় ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙলো দেখি কুয়াশা কখন কেটে গেছে আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। দূরে কালো ফুটকি মত দেখে জোরে দাঁড় বেয়ে ভেলায় আছে পৌছলাম, দেখি জিম মাথাটা হাটুর ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেলার বড় মাথাটা ভেঙে গেছে, ভেলায় চারিদিকে লতাপাতা

ময়লা কতকি আটকে গেছে। তার মানে প্রবল ঝড় ও বিক্ষুব্ধ নদীর মধ্যে ভেতর দিয়ে ভেলা ভেসে এসেছে। আমাকে দেখে জিম বলে উঠলো "ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে তুমি ফিরে এসেছ, ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয় ডুবে গেছ।"

পরের দিন আমরা সকলে ঘুমিয়ে কাটিয়ে ছিলাম। এক সময়ে আমার মনে এই কথা উদয় হল যে আমি একজন পলাতক ক্রীতদাসকে সাহায্য করছি। মিস ওয়াটসন্ ওর সঙ্গে কখন খারাপ ব্যবহার করেননি। তাঁকে ছেড়ে ও পালিয়ে এসেছে। তাছাড়া ও যখন স্বাধীন হবে তখন সে তার স্ত্রী কন্যাকে চুরি করে নিয়ে আসবে বলছে। এই অন্যায় কাজে আমার সাহায্য করা উচিত নয়। অনেক চিন্তা করে এই ঠিক করলাম পরের সহরে আমি কাউকে জানিয়ে দেব ও একটা পলাতক ক্রীতদাস। এমন সময় জিম চিৎকার করে উঠলো দূরে তীরে আলো দেখে। ও আনন্দে নাচতে শুরু করেছে। ক্যানো ও দাঁড় প্রস্তুত করে আমাকে সহরটা দেখে আসার জন্য অনুরোধ করল, "শীঘ্রই আমি স্বাধীন হব হাক্ আর এ শুধু তোমার কৃপায়। পৃথিবীতে আমার একজনই বন্ধু আছে, আর সে হলে তুমি।"

ওর কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল, তবুও যেতে যেতে আমি স্থির করলাম, যা ভেবেছি তাই করব। হঠাৎ দেখি দুজন লোক হাতে বন্দুক নৌকায় করে কখন আমার ক্যানোর পাশে এসেছে। ক্যানো দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এই ভেলায় কোন লোক আছে।" আমি বল্লাম "হ্যাঁ ক্যানোয় একজন আছে।"

"আমরা পাঁচজন পলাতক ক্রীতদাসকে খোঁজ করছি। তোমার ভেলায় যে আছে সে শ্বেতকায় না কৃষ্ণবর্ণ?"

কি বলব! বলতে ইতস্ততঃ করলাম। শেষে বলে ফেল্লাম "শ্বেতকায়।"

ওরা চোখে দেখার জন্য ভেলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমার কথায় ওদের সন্দেহ হয় যে কোন সংক্রামক রুগী আছে ভেলায়। তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। যাবার সময় কাঠের তক্তায় প্রত্যেকে দশ ডলার করে রেখে দূরে সরে গেল।

আমি ফিরে এসে জিমকে ভেলায় খুঁজে পেলাম না। শেষে দেখি ভেলার এক পাশে জলের মধ্যে নাক্ পর্যন্ত ডুবিয়ে সে ঝুলছে। আমার উপস্থিত বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলে জিম। সকাল হলে সব জিনিস পত্তর বেঁধে বাণ্ডিল করলো। সেই রাত্রে আলো দেখে আমি খবর নিতে গিয়ে শুনলাম এই সহর কাইরো নয়। জিম এই কথা শুনে খুব নিরাশ হয়ে গেল।

(৬) গ্রানজারফোর্ডদের কাছ থেকে পলায়ন

পরের রাতেও কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল একটা কালো ছায়া নদীর ওপরে। পরে দেখি একটা স্টীমবোট এগিয়ে আসছে। এনজিনের আওয়াজ কমে আসছে। ছোট ছোট আলো জোনাকির মত জ্বলছে: আমরা আলো জেলে দিয়েছি। ভাবলাম ওরা আলো দেখে পাশ কাটিয়ে-যাবে। কিন্তু আশ্চর্য ওরা

সরছে না, ওদের ঘণ্টা বেজে উঠলো, লোকদের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে তবুও আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শেষে সোজা আমাদের ভেলায় এসে ধাক্কা মারলে, আমরা দুদিকে ছিটকে পড়লাম। নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম, ভাগ্যক্রমে একটা কাঠের তক্তা হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, সেটা ধরে ভাসতে ভাসতে একটা জেটিতে গিয়ে উঠলাম কোন রকমে। নদীর ওপরেই গ্রানজার ফোর্ডদের বিরাট বাড়ি। তারা আমায় আশ্রয় দিল। খুব ধনী আর বেশ সুখী পরিবার। তাদের আমার বয়সী এক ছেলে, নাম তার বেট্‌স, তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এই পরিবারদের সঙ্গে আর এক পরিবার সেফাউসনদের সঙ্গে বিবাদ বহু দিনের। আর এই বিবাদ এত তিক্ততায় পর্যবসতি হয়েছে যে এক পরিবার অন্য পরিবারের কাউকে একলা পেলে অবশ্য খুন করতে দ্বিধা করে না।

গ্রানজারফোর্ডদের এক নিগ্রো ক্রীতদাস একদিন জলাভূমি পেরিয়ে জলচর সাপ দেখাবে বলে আমাকে নিয়ে চল্লো। সেখানে গিয়ে দেখি জিম একটা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সেও ভেসে এখানেই ওঠে ও এই নিগ্রো ক্রীতদাস তাকে শুশ্রূষা করে ভাল করে তোলে, জিম ভেলা থেকে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছিল।

একদিন আবার দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চাড়া দিয়ে উঠলো। এক পরিবারের এক মেয়ে অন্য পরিবারের এক ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। গুলি গোলা চলতে থাকলো। নদীর ধারে আমার বন্ধু বেটসের মৃতদেহ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার মুখটা ঢাকা দিয়ে আমি দৌড়ে পালালাম যেখানে জিম আশ্রয় নিয়ে ছিল। সে আগেই ভেলাটা উদ্ধার করে সারিয়ে রেখেছিল। রাত্রির অন্ধকারে আমরা ভেলা ভাসিয়ে দিলাম। গ্রানজারফোর্ডরা আমায় কাল সকালে খুঁজে না পেয়ে নিশ্চয় ভাববে আমি গুলীবিদ্ধ হয়ে নদীর জলে ভেসে গেছি।

(৭) রাজা ও ডিউকের উদয়

আবার আমাদের দিনগুলো বেশ আনন্দে কাটতে লাগল। প্রতি মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে ভেলা নিয়ে নদীর স্রোতে ভেসে চল্লাম। দিনের বেলায় ভেলা একটা নির্জন জায়গা দেখে লুকিয়ে রেখে রাত্রে আমরা পাড়ি দিতাম।

আমাদের ক্যানোটা কোথায় ভেসে গিয়েছিল। সেদিন ভোরে আর একটা ক্যানো, কপালক্রমে পেয়ে গেলাম। জিমকে ভেলায় রেখে আমি ক্যানোটা নিয়ে ছোট একটা নদীতে উজান বেয়ে চলেছি; যদি কোন চেরিফলের সন্ধান পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখি দুটো লোক পাড় দিয়ে উর্ধশ্বাসে আমার ক্যানোর দিকে ছুটে আসছে। তারা আমাকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ক্যানোয় ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ল ও আমাকে জোরে দাঁড় বাইতে তাগাদা দিতে লাগল। খানিকটা যাবার পর ওদের ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম। এক জনের বয়স প্রায় সত্তর হবে, মাথায় বিরাট টাক কিন্তু গালে লম্বা দাড়ি। পরনে তেল চিট্‌চিটে ছেঁড়া জামা, হাতে একটা কোট, চক্‌ চকে পেতলের বোতাম লাগানো। অন্য লোকটার বয়স বছর তিরিশেক হবে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বড় ব্যাগ।

ভেলায় পৌছে জিম ওদের কফি দিলে। কফি পান করে এক জন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলে,

"তুমি ছুটছিলে কেন?"

যুবক উত্তর দিলে, "সহরে মাজন বিক্রি করে দু পয়সা আসছিল। কাদের নাকি দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে গেছে তারা আমায় তাড়া করে। হ্যাঁ তোমাকে তাড়া করলে কেন?"

বৃদ্ধ বল্লে "আমি ধর্মপ্রচার করে বেড়াতাম, যখন লোকে ধরে ফেলে আমি প্রচারক নই তখন ওরা তাড়া করলে।"

"আমি কি ছিলাম আর কোথায় নেমে এসেছি!"

"তার মানে?"

"তোমরা বল্লে বিশ্বাস করবে না আমি হলাম ব্রিজওয়াটারের ডিউক। আমার পরিবারের কেউ যদি দেখে আমাকে এই অবস্থায়, ওহো! ওহো! আমি চিন্তাই করতে পারছি না।" এই বলে আবার কাঁদতে শুরু করলে। আমি ও জিম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আবার বলতে শুরু করলে, "যদি তোমরা আমায় সত্যি সুখী দেখতে চাও তবে আমাকে ডিউকের

সম্মান দেখাবে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় "মহামান্য", "প্রভু" বলে সম্বোধন করবে।"

এতে কোন অসুবিধাই নেই, তাই আমরা ওর সঙ্গে কথা বলার সময় ওই বলে সম্বোধন করতে লাগলাম, তাতে ওকে বেশ প্রফুল্ল মনে হল।

টেকোকে মোটেই সুখী মনে হল না। সন্ধ্যার দিকে দেখি সে ডিউককে বলছে, "দেখ ব্রিজওয়াটার তুমি ভেব না তোমারই শুধু এই অবস্থার হেরফের হয়েছে আমি কে ছিলাম জান—", বলে কাঁদতে শুরু করল।

ডিউক জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কাঁদছ কেন?" টেকো বল্লে, "আমি কে, তোমাদের বলতে ইচ্ছে করছে না কারণ তোমরা বিশ্বাস করবে না—।"

ডিউক বল্লে, "না না তুমি বল, বল তুমি কে?"

টেকো বল্লে, "আমি সেই নির্বাসিত, সিংহাসন থেকে বঞ্চিত, ন্যায্য ফ্লরেন্সের রাজা। আমি বিস্ফারিত চোখে জিমের দিকে চেয়ে রইলাম।

এরা দুজনেই যে বড় রকমের প্রতারক তা বুঝতে বাকি রইল না তবে আমি কিছু প্রকাশ করলাম না। এরা আমাদের খাবার খেতে লাগলো। আমাদের বিছানায় শুতে লাগলো। ওরা যে আমাদের সঙ্গে চলেছে তাতে আমাদের ভালই লাগতে লাগল।

তারপর প্রথম যে সহরে থামলাম সেখানেই বুঝলাম এ দুজন কত বড় প্রতারক। ডিউক সারা দিন সহরে কাটালে। আমি রাজার সঙ্গে একটা বড় রকমের মেলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। অনেক দোকান পাট, বহু লোক জড় হয়েছে। এক কোনে একটা বড় তাঁবুতে খুব ভিড়, এক ধর্মপ্রচারককে ঘিরে। সবাই স্তবগান গাইছে প্রচারকের নির্দেশে—চারিদিকে কোলাহল। হঠাৎ দেখি রাজা স্টেজে উঠে গেছে ও প্রচারকের অনুমতি নিয়ে বলতে শুরু করেছে, "উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ আপনারা বিশ্বাস করবেন না গতকাল পর্যন্ত আমি একজন জলদস্যু ছিলাম। আমি গত তিরিশ বছর ধরে ভারত মহাসাগরে জলদস্যুগিরি করে এসেছি। আমি এখানে আসি কিছু লোক সংগ্রহ করতে আমাদের দলের জন্য কিন্তু গতকাল আমার যা কিছু ছিল সব অপহৃত হয়েছে আর আমি

স্টীমবোট থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় তীরে নেমেছি—এতে কিন্তু আমি কি আনন্দিত হয়েছি বলবার নয়, সারা জীবনের অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে। অন্য দস্যুদের এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করাই এখন আমার একমাত্র কাজ। আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি একজন দস্যুকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য", এই বলে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিল, সেই দেখে অন্য লোকেরাও কাঁদতে শুরু করেছে। কে একজন ভিড়ের মধ্যে বল্লে, "ওর জন্য কিছু টাকা তুলে দাও।" সবাই রাজি হয়ে গেল। রাজা টুপি হাতে এগিয়ে চল্ল। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সে আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ভেলায় এসে তার সংগৃহীত অর্থ গুনতে বসলো। সাতাশি ডলার তার টুপিতে পড়েছিল। ডিউকের কপাল তত ভাল যায়নি, সে কোন মুদ্রাকরের আফিসে মাত্র কয়েক

ডলার রোজগার করেছে। সে তার ব্যাগে করে এনেছে এক গাদা বিজ্ঞপ্তি।

সেই বিজ্ঞপ্তি থেকে বেরুল এক পলাতক নিগ্রো ক্রীতদাসের ছবি, নীচে লেখা পুরস্কার দুশো ডলার। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি ছবিটা আর কারুরই নয়—জিমের।

ডিউক বল্লে "এবার থেকে আমরা দিনের বেলায়ও ভেলা চালাব। কেউ প্রশ্ন করলে বলব এই পলাতককে আমরা ধরেছি ও পুরস্কার নিতে চলেছি। তবে জিমকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

কদিন বাঁধা অবস্থায় থাকার পর জিম তার আপত্তি জানাল। তখন ডিউকের উর্বর মস্তিষ্কে আর এক ফন্দি খেলে গেল। তারা জিমের সারা শরীরে নীল রঙ মাখালে ও নিজেদের ব্যাগ থেকে কিং লিয়ারের পোশাক পরালে জিমকে ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগলো। ডিউক একটা বড় কাগজে বড় বড় হরফে লিখলে, "অসুস্থ আরব, ক্ষতিকারক নয়। তবে স্বাভাবিক নয়।"

(৮) সেক্সপিয়ারের নাটকের পুনরভ্যুদয়

পরের দিন সকালে আগের দিনের সাফল্যের জন্য দুজনকে বেশ উৎফুল্ল মনে হল। পরের সহরে কোন নাটক উপস্থাপিত করা হবে স্থির হল। অনেক আলোচনার পর তারা ঠিক করলে মাত্র, দুটো দৃশ্য অভিনয় করবে—একটা 'রোমিও জুলিয়েটে'র ব্যালকনি দৃশ্য, অন্যটা হল হল 'রিচার্ড দি থার্ড' থেকে একটা অসি যুদ্ধের দৃশ্য।

সারা সকালটা ধরে চল্লো রিহার্সাল। ডিউক রাজাকে দিয়ে রোমিওর পার্ট বলাল। এরপর দুজনে গাছের ডাল কেটে তলোয়ার তৈরি করলে। ভেলার ওপর অসিযুদ্ধ চলতে চলতে চলতে রাজা বার দুই জলে পড়ে গেল বটে তবে তাদের মহড়া চল্লো দুদিন ধরে।

এরপর যে সহরে থামলাম সেটা দুজনেরই মতে বড় ছোট, ভিড় টানতে পারবে না। তবে ডিউক কোন ছাপাখানায় গিয়ে এক বাণ্ডিল ঘোষণাপত্র ছাপিয়ে নিয়ে এল তাতে লেখা আছে মস্ত হরফে

সেক্সপিরিয়ান নাটকের পুনরভ্যুদয়

অপূর্ব আকর্ষণ

এক রাত্রির জন্য

পৃথিবী বিখ্যাত বিয়োগান্ত অভিনেতা

ডেভিড গ্যারিক (ছোট)

এবং

এডমণ্ড কেন (বড়)

সেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট নাটকের

ব্যালকনি দৃশ্য

এর সঙ্গে

রিচার্ড দি থার্ডএ

রোমাঞ্চকর ভয়াবহ অসিযুদ্ধ ! ! !

পরের যে সহরে আমরা থামলাম সেখানে একটা সারকাস চলছে তাই আমাদের নাটকে প্রচুর লোক সমাগম হবে আশা করা গেল।

সহরে একটা হল ভাড়া করে চারিদিকে প্লাকার্ড লাগালাম সারাদিন ধরে। সেই রাত্রে অভিনয় হল বটে কিন্তু হলে মাত্র বার জন শ্রোতা দেখে ডিউক চটে গেল। এই বার জনের মধ্যে এগার জনই অভিনয় শেষ হবার আগেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়, একজন বালক সিটে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ডিউক বল্লে, "এই মূর্খদের জন্য চাই সস্তা নাটক।" নূতন করে ঘোষণাপত্র লেখা শুরু হল। নতুন ঘোষণাপত্র সহরের চারিদিকে টাঙিয়ে দেওয়া হল যাতে সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব চেয়ে নীচে সব চেয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা হল,

"মহিলা ও শিশুদের প্রবেশ নিষেধ।"

সারাদিন ধরে ডিউক ও রাজা অনেক পরিশ্রম করে স্টেজ তৈরি করলো সামনে একটা চকচকে পর্দা টাঙিয়ে। মোটা মোটা মোমবাতি বসালে পাদপ্রদীপ হিসাবে। সে রাত্রে লোকের সমাগম হল আশাতীত। যখন আর হলে তিল ধারণের স্থান নেই তখন ডিউক স্টেজে উঠে পড়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতায় বল্লে এর চেয়ে নাকি বিয়োগান্ত নাটক পৃথিবীতে লেখা হয়নি। যখন লোকের উত্তেজনা চরমে পৌছেছে তখন ডিউক নিজে সরে গিয়ে পর্দা তুলে দিল। পরের মুহূর্তে রাজা চার পায়ে তিড়িং

তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে স্টেজে প্রবেশ করলো সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার শরীরে রামধনুর মত উজ্জ্বল সাতটা রঙ আঁকা, কোথাও লম্বা ডোরা কাটা আবার কোথাও গোল বৃত্ত আঁকা। রাজার এই রকম নাচ দেখে লোকের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। রাজা স্টেজের এদিকে ওদিকে তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে স্টেজে ঢুকে পড়ল কিন্তু আবার তাকে নামতে হল লোকের হাততালিতে।

তারপর ডিউক শ্রোতাদের কাছে মাথা নুইয়ে যখন জানালে যে তাদের নাটকের এইখানেই সমাপ্তি আর তারা আরও দুরাত্রি মাত্র এই অভিনয় এখানে দেখাবে কারণ তারা লণ্ডনে এই আঙিনায় দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে। তখন শ্রোতাদের মধ্যে তাদের এই রকম বোকা বানানোর জন্য বিক্ষোভ দেখা দিল। তখন একজন বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে অন্যদের বল্লে, "ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা উত্তেজিত হবেন না। এরা আমাদের খুব বোকা বানিয়েছে। কিন্তু আমরা চাই না সহরের সবাইএর কাছে আমরা উপহাসের পাত্র হই। আপনারা শান্তভাবে বেরিয়ে যান একে একে আর বাইরে গিয়ে সবাইকে বলবেন যে এটা মানে 'রয়েল নানসাচ' একটা উপভোগ্য নাটক।

সবাই এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে আস্তে আস্তে নিষ্ক্রান্ত হল হল থেকে।

দ্বিতীয় রাত্রেও লোকে ভিড় করলে দলে দলে। রাত্রে ভেলায় ফিরে এসে ডিউক আমাদের বল্লে আমরা যেন ভেলা নিয়ে স্রোতের টানে আরও দু মাইল আগিয়ে গিয়ে একটা নির্জন জায়গা দেখে ভেলা বেঁধে রাখি।

তৃতীয় রাত্রেও হল ভর্তি, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আগের দু রাত্রে যারা এসেছিল তারাই এ রাত্রে হলে প্রবেশ করছে আরও লক্ষ্য করলাম সবাই পকেটের মধ্যে কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে ঢুকছে। আর পচা ডিম আর পচা তরিতরকারির গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন সকলেই হলে প্রবেশ করে গেছে তখন একজনকে প্রবেশ পথটা দেখতে অনুরোধ করে ডিউককে পেছনের দিকে যেতে দেখে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। যখন অন্ধকারে এসে গেছি তখন আমরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। ভেলায় পৌঁছেই ভেলা ভাসিয়ে দিলাম। আমি ভাবছি বেচারা রাজার অবস্থা, লোকেদের হাতে ওর কি দশা হবে! কিছুক্ষণ পরে রাজাকে ভেলার

ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। উঃ কি ধড়িবাজ লোক সে আজ সহরেই যায়নি।

প্রায় দশ মাইল যাবার পর আলো জেলে আমরা নৈশ-ভোজে বসলাম। রাজা আর ডিউকের সে কি হাসি! ডিউক বল্লে, "আমি জানতাম ওরা তৃতীয় রাত্রের জন্য অপেক্ষা করবে। এখন কি রকম মজা করা গেল। ওরা পচা ডিম আর বাসি তরিতরকারি দিয়ে কিরকম পিকনিক করছে।"

এই শয়তানরা তিন দিনে চারশ পঁয়ষট্টি ডলার লোককে ঠকিয়ে নিয়েছে। আমরা ধীরে সুস্থে ভেলা এগিয়ে নিয়ে চল্লাম। এবার যে সহর আসছে সেখানে আবার নতুন কিছু করার জন্য আলোচনা করতে লাগল ওরা।

(৯) উইলিয়াম ও হার্ভে ভ্রাতৃদ্বয়

রাজা ও ডিউক ঐ নাটক 'রয়েল নানসাচ্' এর সাফল্যের পর দুই একটা সহরে আবার ঐ নাটক করবার মনস্থ করে, তবে শেষ পর্যন্ত অত ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি। এবার যে সহরে আমরা এসে থামলাম সেখানে রাজা নতুন কি পরিকল্পনা করেছে ও আমাকে তার সাহায্য করতে হবে। আমাকে নতুন জামা কিনে দিয়েছে ওরা, তাই পরে ফিটফাট হয়ে রাজার সঙ্গে ক্যানোয় করে নতুন সহরের

দিকে চলেছি। সকালটা খুব মনোরম তার ওপর রাজার স্ফূর্তি ধরে না, শিস্ দিয়ে একটা মিষ্টি সুর ভাঁজছে। আমার ভালও লাগছে আবার উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। এই শয়তানকে সাহায্য করতে গিয়ে আবার কোন বিপদে না পড়ি।

নদীর পাড়ে এসে দেখি একজন যুবক দুটো বড়ো ব্যাগ নিয়ে একটা কাঠের তক্তার ওপর বসে আছে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন কিনা। সে বল্লে সে নিউ অরলিয়নসের জাহাজ ধরবে। তাকে জাহাজ ঘাটে পৌঁছে দিলে সে উপকৃত হয়। রাজা আমাকে বল্লে, ওর ব্যাগ দুটো ক্যানোয় তুলে দিতে। যেতে যেতে যুবক রাজাকে বল্লে "আপনাকে প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি মিঃ উলফ্‌স।" রাজা ভারিক্কি চালে বল্লে "না আমার নাম রেভারেণ্ড ব্লডগেট আর এ হল আমার চাকর এডলফ্যাস। তা আপনি উলফ্‌সকে আশা করছিলেন কেন?"

তখন যুবক বল্লে সহরে পিটার উলফস্ বলে এক ভদ্রলোক কাল রাত্রে মারা গেছে। সে এই রোগ শয্যাতে রোজই তার দুই ভাইকে ইংলণ্ড থেকে আশা করছিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলে এই দুই ভাইকে সহরের কেউ চেনে কিনা আর এই ভাই-এর বয়স কত। যুবক জানালে এই সহরের কেউই চেনে না। পিটার ভাইদের বহুদিন দেখেনি। দুই ভাই-এর যে বড় তার নাম হার্ভে সে একজন ধর্মপ্রচারক আর তার বয়স প্রায় সত্তর হবে আর ছোট ভাই বোবা ও কালা বয়স হবে তিরিশ সাঁইত্রিশ, আর তাকে নাকি পিটার কখনও দেখেইনি।

তখন রাজা সব খবর যুবকের কাছে নিতে লাগলো—পিটারের আর ভাই আছে কি না, এই সহরে পিটারের বন্ধুদের নাম কি। যুবক জানালে পিটারের আর ভাই নেই তবে তিন ভাইঝি পিটারের এখানেই থাকে, বন্ধুদের নামও জানালে। যুবক আরও বল্লে, পিটার ভাইদের উদ্দেশে চিঠি লিখে রেখে গেছে তাতে নাকি তার লুকানো টাকা আছে তা লেখা আছে।

রাজা যুবককে জাহাজঘাটে নামিয়ে দিয়ে নিজে পাড়ে নেমে গেল ও আমাকে যত শীঘ্র পারি ডিউককে ক্যানোয় করে নিয়ে আসতে বল্লে।

আমি ডিউককে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে নামালাম পাড়ে। তখন দুই শয়তানে নিজেদের পিটারের ভাই বলে চালান যায় কিনা তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

ডিউক বল্লে তার পক্ষে বোবা ও কালার ভান করা এমন কিছু নয়। রাজাও বড়াই করে বল্লে এক ইংরেজকে অনুকরণ করা—সে ঠিক স্টেজে মেরে দেবে।

দুপুরে একটা বড় নৌকায় চেপে আমরা ফেরিঘাটে যখন নামলাম তখন অনেক লোক আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাজা খুব গম্ভীর ভাবে একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেউ কি আপনাদের মধ্যে বলতে পারেন পিটার উলফস্ কোথায় থাকেন?"

লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "নিশ্চয়ই এরাই হবে।" তারপর একজন এগিয়ে এসে বল্লে, "খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পিটার গত রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।"

রাজা কাঁদতে শুরু করলে। ডিউক অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চেষ্টা করলে ডিউকও কাঁদতে শুরু করেছে। লোকের ভিড় জমে গেছে। তারা আমাদের পিটারের বাড়ি নিয়ে চল্লো।

পিটারের তিন অল্পবয়সী ভাইঝি আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল। ওদের চোখে জল। বড় মেরি জেন, তার বয়স উনিশ, অন্য দুজন সুসান আর জোয়ানা। তারা কখনও কাকাদের দেখেনি, তারা বুঝতে পারলে না, এরা তাদের ঠকাতে এসেছে।

যখন দেখাশুনার পালা শেষ হয়ে আবহাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে তখন পিটারের উইল পড়া হল। পিটার বাড়ি ও তিন হাজার ডলার ভাইঝিদের দিয়ে গেছেন এবং ছ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গেছেন ভাইদের। তাছাড়া অন্য যা সম্পত্তি আছে তা ভাইরা ইচ্ছামুসারে ব্যবহার করবেন।

উইল পড়ার পর রাজা ও ডিউক যখন উইলের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা এনে ভাইঝিদের হাতে তুলে দিল তখন কারুর মনে আর সন্দেহ রইলনা যে এরাই

এদের কাকা। ভাইঝিরা কাকাদের আদর করে চুম্বন করলে। রাজা পাকা অভিনেতা, চোখে জল নিয়ে এসে বল্লে, "কত আদরের ভাইঝিরা, আমার।" ডিউকও কমতি যায় না সে বলতে লাগলো, "ওঃ ওঃ ওঃ।"

রাজা এক ছোট বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত সবাইকে ভোজে নিমন্ত্রণ করলে ও লণ্ডনের বিষয় অনেক বানিয়ে বানিয়ে বলতে লাগলো। হঠাৎ মৃত পিটারের বন্ধু ডাঃ রবিনসন উপস্থিত হলেন। তিনি রাজার কথা শুনেই চটে গিয়ে বল্লেন পিটারের ভাইঝিদের উদ্দেশ করে, "এরা ইংরেজদের মত কথা বলার অনুকরণ করছে, এরা দুজনেই ভণ্ড, এদের প্রতারণায় ভুলো না।" উপস্থিত সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু মেরি জেন ডাক্তারের কথায় কর্ণপাত না করে টাকার থলেটা রাজার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে, "এঁদের আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো ও রাজা হাত তুলে রাজসিক চালে সবাইকে অভিবাদন করল।

ডাক্তার রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রাজা ও ডিউকের দোতলার একটা বড় ঘরে থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে আমার বরাদ্দ হয়েছে চিল কোটায় একটা ছোট ঘরে।

আমার এই সকল মেয়েদের দেখে দয়া হল। আমি মনস্থ করলাম এই শয়তানদের কিছুতেই এদের ন্যায্য টাকা আত্মসাৎ করতে দেব না।

(১০) কফিনের মধ্যে টাকার থলি

মেরি জেন ও তার বোনদের শুভরাত্রি জানিয়ে সোজা চলে এলাম রাজা ও ডিউকের বরাদ্দ ঘরে। তখনও নীচে বৈঠকখানা থেকে রাজার ও অভ্যাগত অতিথিদের কাশি ওপরে শোনা যাচ্ছে। সবে ঢুকেছি, কানে এল বাইরে পদশব্দ, চকিতে একটা পর্দার পাশে লুকিয়ে পড়লাম। রাজা ও ডিউক ঘরে ঢুকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল তারা এই স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে সরে পড়বে না আরও কিছু চেষ্টা করবে। রাজা ও ডিউক দুজনের টাকার থলেটা একটা নিরাপদ জায়গায় রাখার প্রয়োজন মনে করলে, ও আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তার দু ফুটের মধ্যে একটা গদির তলায় থলেটা রেখে নীচে নেমে গেল। আমি ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আর কি! ওরা আমার কাজ সোজা করে দিল। আমি থলিটা নিয়ে সন্তর্পণে আমার ঘরে ঢুকে, দিলাম দরজা লাগিয়ে। থলিটা

বুকের কাছে রেখে জেগে রইলাম। রাত তিনটে, যখন সব বাড়ি নিস্তব্ধ ও রাজা ও ডিউকের ঘর থেকে তাদের নাক ডাকার শব্দ আসছে তখন পায়ে পায়ে আমি যে ঘরে পিটারের কফিন পড়ে আছে, সেই ঘর দিয়ে বাইরে যেতে গিয়ে দেখি দরজায় তালা লাগানো। যাদের মৃতদেহ পাহারা দেবার কথা তারা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ কানে এল। আমি এখন কি করি। থলে শুদ্ধ ধরা পড়লে আমার অবস্থা কি শোচনীয় হবে চিন্তা করা যায় না। আমি চকিতে কফিনের ডালাটা খুলে পিটারের বুকের কাছে থলে রাখতে গিয়ে তার ঠাণ্ডা হাত আমার হাতে লেগে গেল। আমার সারা শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে যাবার জোগাড়। আমি দরজার পাশে লুকিয়ে পড়লাম। দেখি মেরি জেন অত রাত্রে ঘরে প্রবেশ করে মৃত পিটারের কফিনের কাছে নতজানু হয়ে বসেছে, তার চোখে জল। আমি সন্তর্পণে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন অনেক লোকের উপস্থিতিতে পিটারের দেহ সমাহিত হল। বুঝতে পারলাম না যারা কফিনের কাঁটা ঠুকে ছিল তাদের চোখে থলেটা পড়েছিল কিনা।

রাজা ও ডিউক তাদের নিজের কাজ গোছাতেই ব্যস্ত।

প্রথমেই পিটারের পুরানো নিগ্রো ক্রীতদাসদের বিক্রি করে দিল এক দাস ব্যবসায়ীর কাছে। এরা মেয়েদের খুব প্রিয় ছিল, তারা এই খবরে খুব মুষড়ে পড়ল।

দ্বিতীয় পদক্ষেপে পিটারের অন্য সম্পত্তি যখন নিলামে তুলতে তারা ব্যস্ত তখন একটা স্টীম বোট ফেরিঘাটে এসে লেগেছে। এর আগে সকালে থলি খোওয়া যাওয়ার ব্যাপারে ওরা আমাকে এসে ধরে, প্রথমে আমি কিছুই জানিনা বল্লাম। পরে কি মনে হল বল্লাম নিগ্রো ক্রীতদাসদের ওদের ঘরে বার দুই ঢুকতে দেখেছি। ওরা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলো কারণ ক্রীতদাসরা তাদের বিক্রি করে দেওয়াতে বহুদূরে চলে গেছে ও এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ওরা খুব মনমরা হয়ে গেছে এইরকম দাঁও হাত ছাড়া হওয়াতে। এখন নিলাম করে যা পাওয়া যায়। নিলাম চলছে এমন সময় এক বৃদ্ধ ও এক যুবক একদল লোকের সঙ্গে বাড়ির সামনে উপস্থিত হল। এরা দুজনেই নাকি মৃত পিটারের ভাই, ইংলণ্ড থেকে আসছে। সবাইকার মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা। তাদের ঘিরে সবাই দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে রাজা ও ডিউকও আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সুন্দর ইংরেজিতে তার ও তার ভাইএর দেরি হবার কারণ বল্লেন, আর অন্য দুজন লোক পিটারের ভাই বলে দাবি করছে জেনে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারা হোটেলে থাকবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন যতক্ষণ না কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।

ভিড় ঠেলে ডাক্তার প্রবেশ করলেন ও সবাইকে উদ্দেশ করে বল্লেন, প্রতিবেশিগণ আগের লোক দুজন যে ভণ্ড তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে আমি প্রথম দর্শনেই ধরেছিলাম। এখন এঁরা দুজন যে প্রতারণা করছেন না তাও হলফ্ করে বলা যায় না। এখন আসল দাবিদার নিরুপণ করতে হবে। এদের সবাইকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া যাক।"

পিটারের পুরানো বন্ধু এক আইনবিদ একই স্টীমারে এসেছিলেন। তিনি রাজা, ডিউক ও নতুন বৃদ্ধের হাতের লেখা পরীক্ষা করলেন। কারুর হাতের লেখা মিলল না। নতুন যুবকের হাত পটি দিয়ে বাঁধা, তাই তার হাতের লেখা যাচাই করা গেল না। নতুন বৃদ্ধ অবশ্য বল্লে পিটারকে লেখা চিঠিগুলো তার ছোট ভাইয়ের লেখা তার হাত ভেঙে যায় পটি বাঁধা আছে। সরাইকার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। তাদের মতে এই চারজনই প্রতারক ও এদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হক। নতুন বৃদ্ধ অবশ্য প্রস্তাব করলেন, আমার মৃত ভাই এর বুকে কি উল্কি করা আছে এরা বলুক। আর নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে যারা পিটারকে কফিনে শুইয়ে ছিলেন তারা অবশ্য তার অনাবৃত বক্ষ দেখে থাকবেন।" রাজা তাড়াতাড়ি বল্লে পিটারের বুকে নীল তীর আঁকা আছে। কিন্তু নতুন বৃদ্ধ হেসে বল্লেন উল্কি করা আছে 'পি-বি-ডাবলু', কিন্তু যারা কফিনে পিটারকে শায়িত করেছিলেন তারা পিটারের বুকে কোন উল্কি করা নেই বলাতে আবার সমস্যার উদ্ভব হল। তখন ডাক্তারের প্রস্তাবে মৃতদেহ কবর থেকে তুলে যাচাই করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই পিটারের কফিন ওপরে তোলা হল। ডালা খোলার সময় বিদ্যুৎের ঝলকানি। সবাই চিৎকার করে বল্লে, "হায় ভগবান! স্বর্ণমুদ্রার থলেটা পিটারের বুকের ওপর।" যে লোক আমার হাত ধরে ছিল সে আমার হাত ছেড়ে কফিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি ঘুরেই তীরের দিকে দৌড়লাম। একটা নৌকা দেখে লাফিয়ে উঠে পড়ে ভেলার দিকে দাঁড় বেয়ে চল্লাম। ভেলায় উঠেই জিমকে বল্লাম, জিম আর এক সেকেণ্ড দেরি নয় ভেলা ছেড়ে দাও। ভগবানের কৃপায় শয়তান দুটোর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।

আমরা আনন্দে নাচছি। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল, পেছনে চেয়ে দেখি একটা নৌকো জোরে দাঁড় বেয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। নৌকার ওপর রাজা ও ডিউককে দেখে আমি কেঁদে ফেল্লাম।

(১১) জিম আবার ধরা পড়ল

ভেলাতে উঠেই রাজা আমার ওপর খড়্গহস্ত, "আমাদের ফেলে পালাবার মতলবে ছিলি, তোকে জলে ডুবিয়ে মারব," বলেই আমার ঘাড় ধরেছে। সেই দেখে ডিউক

ওকে গালাগালি দিতে লাগল, "বুড়ো নির্বোধ তুই ছাড়া পেয়ে একবারও কি ছেলেটার কথা চিন্তা করেছিলি? এখন ওকে মারতে যাচ্ছিস।" রাজা আমাকে ছেড়ে দিয়ে গজরাতে লাগল। এরপরে দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেল এ বলে তুই টাকার থলি লুকিয়েছিলি ও বলে তুই লুকিয়েছিলি। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর দুজনে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেল ও ঝগড়া ভুলে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ওদের নাক ডাকার শব্দ শোনাগেল তখন জিমকে সব ঘটনা বললাম।

এরপর কদিন কোথাও না থেমে ভেসে চললাম, কারণ কোথাও নামতে সাহস হল না। বেশ কয়েকদিন পরে ওরা দু-একটা সহরে রোজগারের চেষ্টা করলে তবে কোথাও আমল পেল না।

পাইকভেলি বলে একটা সহরের কিছুদূরে ভেলা দাঁড় করিয়ে রাজা একাই সহরে গেল ডিউককে বলে যে সে এখানে "রয়াল নানসাচ" অভিনয় করা যায় কিনা দেখতে যাচ্ছে। আমি ও ডিউক ওকে ফিরতে না দেখে সহরে গিয়ে দেখি ও একটা সেলুনে বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ডিউকের সঙ্গে কথা কাটা-কাটি থেকে মারামারিতে পরিণত হতে দেখে আমি ভেলায় ফিরে এলাম, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম জিমকে কোথাও না দেখে। আমি জঙ্গলে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলাম কিন্তু জিম এর কোন সাড়া শব্দ নেই। সহরে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় একটা ছেলে জানালে এক টেকো বুড়ো, মস্ত দাড়ি আছে সে একজন কৃষক সাইলাস ফেলপস এর কাছে মাত্র চল্লিশ ডলারে একজন নিগ্রোকে বিক্রি করেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই শয়তানদের জন্য আমরা এত করলাম তার বিনিময়ে ওরা ওকে বিক্রি করে দিল। আমি ভেলায় ফিরে এলাম ও মিস ওয়াটসন কে চিঠি লিখলাম যেন তিনি চল্লিশ ডলার পত্রপাঠ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যদি জিমকে ফিরে পেতে চান। তারপর জিমের কথা কেবলই মনে হতে লাগল। এই কদিন আমরা সুখ দুঃখে এক সঙ্গে কত ঝড় ঝাপ্টা কাটিয়ে উঠেছি। জিমের আমাকে 'হ্যানি' বলে সম্বোধন, তার আন্তরিক ভালবাসা সত্যি ভোলবার নয়। আমি চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে উদ্ধার করব মনস্থ করলাম। আর এই শয়তান দুটোর মুখ আর দেখতে ইচ্ছে নেই।

(১২) টম ও সিড স্যইয়ার

আমি ভেলাটাকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলাম যেন শয়তান দুটো দেখতে না পায়। তার পর সহরে ফিরে দেখি ডিউক 'রয়াল নানসাচ' প্রাকার্ড মারছে। সে আমাকে দেখে বল্লে আমি যেন এখানকার কাউকে না বলি তাদের এই নাটকের কথা। ও মিথ্যা করে বল্লে

একজন কৃষকের নাম তার কাছে রাজা জিমকে বিক্রি করেছে। ও আসলে চায় আমি সহর থেকে সরে যাই।

আমি হেঁটে হেঁটে সাইলাস ফেলপস্ এর খামারের রাস্তা ধরে একটা বিরাট গেট দেখে ঢুকে পড়লাম। দেখি প্রকাণ্ড সাদা বাড়ি, চারিদিকে সাদা পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেছি, কেউ প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেব ভাবছি না। ডান দিকের পাঁচিলের ধারে তিনটে কেবিন থেকে ধোঁয়া উঠছে। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড গ্রে হাউণ্ড কুকুর তেড়ে এল। আমি দাঁড়িয়ে গেছি, নড়লেই ছিড়ে ফেলবে। একে একে আরও কুকুর এসে ঘিরে ফেল্লো। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কপাল ভাল কোথা থেকে একটি নিগ্রো মহিলা লাঠি হাতে কাঠের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কুকুরগুলো তাড়িয়ে দিলে।

ওদিকে বাড়ির ভেতর থেকে এক ভদ্রমহিলা প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আমাদের দিকে আসছেন, ভদ্রমহিলার মুখে হাসি, তার পেছনে দুটো বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছুটে আসছে। এসেই ভদ্রমহিলা বল্লেন, "এত দিন পরে তুই সেই এলি?"

আমি কোন রকম ইতস্ততঃ না করে বল্লাম, "হ্যাঁ, ম্যাম"। তিনি মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন, "তুই তোর মার মত হসনি। তাতে কিছু যায় আসে না। তুই যে এসেছিস তাতে কি আনন্দ যে হয়েছে, বলবার নয়। স্টীমারে প্রাতরাশ করেছিস ত?"

"হ্যাঁ ম্যাম।"

"ম্যাম ম্যাম বলবিনা। বলবি আন্টি। তোর এত দেরী হল কেন?"

"এনজিনের গোলমাল দেখা দেয়', বল্লাম আমি। আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন ড্রইংরুমে।

"তোর মালপত্র কোথায়?"

"সহরে রেখে এসেছি" মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। "তারপর খবর কি? তোর আঙ্কেল এলে গাড়ি করে মাল নিয়ে আসবি তার সঙ্গে গিয়ে। তুই করছিস কি এখন? দিদি কেমন আছে?" আমি কিছু বানিয়ে বলতে যাব হঠাৎ আমার মুখ চেপে ধরে খাটের পাশে মাথা নিচু করে থাকতে বল্লেন।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলে ভদ্রমহিলা বল্লেন," কই? সে আসেনি?"

'না,' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন।

"দেখ সাইলাস রাস্তা দিয়ে কেউ আসছে নাকি?" ভদ্রলোক জানালার দিকে এগিয়ে গেছেন তখন ভদ্রমহিলা আমাকে টেনে তুলে ধরলেন। মিঃ সাইলাস ফিরে আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বল্লেন, "এই কি টম শুইয়ার?" তাঁর মুখে হাসি। ভদ্রমহিলার আনন্দ ধরে না। টমের পরিবারের সবাইকার কথা আমি বলতে লাগলাম। আমার নতুন জন্মলাভ হল যেন। খুব আনন্দ ও আরামদায়ক লাগছে। হঠাৎ একটা স্টীমবোটের হুইসিল কানে এল। যদি টম ওই বোটে আসে আর আমাকে দেখে হ্যাক্ বলে ডেকে ওঠে!

আমি সহরে গিয়ে মালপত্রর আনার কথা আঙ্কেল সাইলাসকে বল্লাম। তিনি আমার সঙ্গে আসতে চাইলেন কিন্তু আমি একাই আনতে পারব বলাতে রাজী হয়ে গেলেন।

সহরের পথে উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি আসতে দেখে গাড়িটা থামালাম। দেখি গাড়ির মধ্যে টম্ বসে। আমাকে দেখে ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও ঢোঁক গিলে বল্লে, "না না আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি, কেন কেন তুমি আমাকে দর্শন দিচ্ছ? তুমি কৃপা করে—"

আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। সেই শুনে ওর খানিক সাহস হয়েছে,—বল্লে, "তুমি ভূত নও?"

"তুমি নেমে এসে স্পর্শ করে দেখ। সবাইকে আমি বোকা বানিয়েছি।"

নেমে এসে স্পর্শ করে ওর কি আনন্দ। কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ওকে সব বল্লাম। শেষে ওর আঙ্কেলের পরিবার আমাকে টম বলে জানে, এ কথাও বল্লাম।

টম বল্লে, "এ কোন সমস্যাই নয়।" এই বলে সে আমাকে তার মাল নিয়ে ফিরে যেতে বল্লে। সে একটু পরেই আসছে। ও যখন ফেলপস্‌দের বাড়ি এসে পৌছাবে আমি যেন ওকে না চেনার ভান করি। ওকে জিমের কথাও বল্লাম, সে কথা দিল সে জিমকে উদ্ধার করতে অবশ্যই সাহায্য করবে। টমকে আবার বন্ধু হিসাবে পেয়ে আমার কি যে আনন্দ হল তা বলবার নয়।

আমি পৌছানর কিছু পরে টম ফেলপসদের বাড়িতে গাড়ি থেকে নামলে। প্রথমে সে জানায় সে মিঃ নিকোলাসের বাড়ি ভুল করে নেমে পড়েছে। মিঃ সাইলাস তাকে ডিনার খেয়ে যেতে অনুরোধ করেন। খাবার টেবিলে সে আন্টিকে বলে সে টমের ভাই সিড। এই শুনে ফেলপস্ পরিবারের আনন্দ আর ধরে না তারা বিশ্বাস করতে পারিনি যে টমের সঙ্গে তার ভাই সিড আসতে পারে।

সেই সন্ধ্যায় আমি আর টম সহরের দিকে বেড়াতে চল্লাম। পথে ওকে আমাদের অভিযানের কথা একটার পর একটা বল্লাম আর টম মন্ত্রমুগ্ধের মত সব শুনলে। সহরের কাছাকাছি পৌছে দেখি এক দল লোক চলেছে. তাদের সামনে দুটো লোক চলেছে তাদের মুখে আলকাতরা ও মাথায় পালক গোঁজা—লোক দুটো আর কেউ নয় রাজা ও ডিউক।

(১৩) অশান্তির মেঘ জমছে

এসে পর্যন্ত জিম কোথায় আছে জানতে পারিনি। বেড়ার পাশের একটা কাঠের কেবিনে নিগ্রো ক্রীতদাসটাকে রোজ খাবার নিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ হল জিমকে এই কেবিনেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। টমকে বল্লাম জঙ্গলে ভেলাটা ঠিক করে রেখে এসে বুড়ো ফেলপস্-এর পকেট থেকে চাবি চুরি করে জিমকে সোজা গিয়ে তুলব ভেলাতে। টমের এ প্রস্তাব মনমত হল না। সে চায় না এত সহজে ওকে উদ্ধার করা। ওর পরিকল্পনা সব সময়ে বিপজ্জনক আর টমের কর্মসূচী ক্ষণে ক্ষণে বদলাবে।

সন্ধ্যায় সেই কেবিনের কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম ওপরে একটা জানলা ছিল সেটা উপস্থিত তক্তা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এই জানালা দিয়ে জিমের পলায়নের প্রস্তাবও টমের মনমত হল না। "এ তো খুব সোজা এর চেয়ে কঠিন উপায়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে," টমের মন্তব্য। কেবিনের পাশে একটা গুদাম, টম সেই দেখে বল্লে, এই গুদাম থেকে সুড়ঙ্গ কাটা হবে জিমের কেবিন পর্যন্ত, সেই দিয়ে জিম বেরিয়ে আসবে। পরের দিন নিগ্রোটাকে টাকা দিয়ে আমরা জিমের কেবিনে প্রবেশ করলাম, অন্ধকার ঘর আমরা ওকে দেখতে পাইনি তবে জিম আমাদের চিনতে পেরে আমাদের নাম করে ডেকে ওঠে। নিগ্রোটা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমরা জিমকে চিনি কিনা। কিন্তু আমরা এমন ভাব দেখালাম যেন নিগ্রোটা ভুল শুনেছে। তারপর টমের উদ্ভট পরিকল্পনা একটার পর একটা মাথায় আসতে লাগল। সাধারণতঃ বন্দীরা দড়ির মই বেয়ে পালায়, তাই জিমকে দড়ির মই দিতে হবে সেটা তার দরকার হোক বা না হোক। তাকে একটা শার্ট দিতে হবে যার ওপর সে ডাইরি লিখবে কিন্তু যখন বল্লাম জিমতো লিখতেই জানে না তবুও টমের জেদ সে একটা কাঠ ও রক্ত দিয়ে শার্টের ওপর মার্কা দেবে অন্তত। আমরা গুদাম থেকে জিমের কেবিনের খাটের তলা পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কেটে ফেলাম তিন দিন ধরে। জিমের পা খাটের পায়ার সঙ্গে শেকলে বাঁধা ছিল। টম প্রথমে খাটের পায়াটা কেটে ফেলার প্রস্তাব করলে। পরে জিমের পাটাই কেটে ফেলার কথায় জিম প্রবল আপত্তি তুললে। শেষে জিম একটা বাটালি চাইলে তা দিয়ে শেকল কেটে ফেলবে।

ক্রমে ক্রমে জিমের কেবিনে দড়ির মই, শার্ট বড় ছুরি সব পাঠান হল।

বুড়ো ফেলপস্ খবরের কাগজে জিমের ছবি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। শুধু এখানের কাগজেই নয় সেণ্ট লুইস মানে আমরা যেখানে বাস করি সেই সহরের কাগজেও বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে শুনে আমরা ঘাবড়ে গেলাম।

টম্ এবার বল্লে বেনামী চিঠি দিতে হবে। আমি তার কি দরকার প্রশ্ন করায় বল্লে লোকদের সতর্ক করে দেওয়া যে

কিছু একটা ঘটতে চলছে। আমি বল্লাম "আমরা বন্দীকে উদ্ধার করতে চলেছি সেটা আবার লোকদের জানাতে যাব কেন?"

"কেউ জানবে না আমরা বন্দীকে নিয়ে পালাচ্ছি তার মধ্যে দুঃসাহসিকতা কোথায়? তোমাকে বাড়ির সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে চিঠি ফেলে দিয়ে আসতে হবে একটা পরিচারিকার বেশে।"

"পরিচারিকার বেশ পরতে হবে কেন? আমি এমনি ফেলে দেব, কেউ দেখতে পাবে না তো!"

"কেউ দেখুক আর না দেখুক আমাদের কর্তব্য করে যেতে হবে। লুই-দি ফোর্টিন্ যখন পালিয়ে যায় তখন এক পরিচারিকা এই বেনামী চিঠি দিয়ে এসেছিল।"

আমি খুব অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজি হলাম। আমি চিঠি রাত্রে বাড়ির সদর দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিলাম। তাতে লেখা ছিল:

সাবধান। সামনে বিপদ। মেঘ জমেছে —অজানা বন্ধু

পরের দিন টম একটা কাগজে রক্ত দিয়ে আঁকলো একটা করোটি তার নিচে আড়াআড়ি ভাবে দুটো হাড়। সেটা দরজার সামনে সেঁটে দেওয়া হল। পরিবারের সবাই

ভীষণ আতঙ্কিত। সামনে ও পেছনে দুজন নিগ্রো সব সময় পাহারা দিতে লাগলো। শেষ রাত্রে আমি ও টম্ চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিলাম, যে নিগ্রোটা পাহারায় ছিল সে তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এতে লেখা ছিল :

আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আপনার বন্দী ক্রীতদাসকে আজ মুক্তি দেওয়া হবে। তারা তাকে মধ্যরাত্রে উদ্ধার করবে। ওরা যখন কেবিনে প্রবেশ করবে তখনি আমি 'ব্যাঃ' 'ব্যাঃ' ডাক দেব। যখন এই ডাক শুনবেন তখনই কেবিনের দরজার তালা দেবেন।

অজানা বন্ধু

(১৪) জিম মুক্তি পেল

পরেরদিন প্রাতরাশ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে দুপুরের খাবার নিয়ে। ক্যানো নিয়ে দাঁড় বেয়ে-বেয়ে মাছ ধরতে লাগলাম। ভেলাটা পরীক্ষা করে একটা নিরিবিলি জায়গায় রেখে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। সন্ধ্যা হতেই আন্টি আমাদের খাওয়া দাওয়া সারিয়ে শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। সবাই ভীষণ ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু কারণ কি কেউ কিছু মুখ খুলছে না। রাত্রি এগারটা বাজছে দেখে টম আমাকে ভাঁড়ার ঘর থেকে মাখন আনতে বল্লে, আগেই আমরা খাবার এনে পকেট ভর্তি করে রেখে ছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাব দেখি মোমবাতি হাতে আন্টি নামছে। আমাকে জোর করে ধরে বাঁদরের ঘরে একলা বসিয়ে রাখলে। সেখানে দেখি ঘর ভর্তি লোক, জন পনর কৃষক, প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। তারা প্রত্যেকে খুব উত্তেজিত, এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পায়চারি করছে আর কথা বলছে ফিস্ ফিস্ করে। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বারটা বাজতে বেশী দেরী নেই। আন্টি আমাকে ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলাতে আমি আর দেরি করলাম না, ওপরে উঠেই জানালা টপকে পাইপ বেয়ে নেমে গুদামের দিকে ছুটলাম। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে জিমের কেবিনে ঢুকেই আমি বল্লাম "আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, বাড়ি ভর্তি লোক বন্দুক হাতে।"

টম বল্লে তাইনাকি! আর যদি কদিন অপেক্ষা করতাম, হ্যাক, তখন দেখতে দুশো লোক বন্দুক হাতে আমাদের রুখতে আসতো।

আমি বল্লাম, "ওসব কথা ছাড়। জিম কোথায়।" দেখি জিম আন্টির এক গাউন পরে পাশেই দাঁড়িয়ে। এও টমো আর এক উদ্ভট পরিকল্পনা। লুই দি ফোর্টিন নাকি তার মায়ের গাউন পরে পালিয়েছিল।

বাইরে কাদের পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন কেবিনের তালা খুলছে। আমরা আর দেরি না করে হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এসে পড়লাম গুদামে, বাইরে আরও পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমরা দৌড়লাম বেড়ার দিকে। জিম ও আমি টপকে ওপারে পড়লাম কিন্তু টমের প্যান্ট এক খোঁচায় আটকে গেল ও একটা আওয়াজ হল। কে চেঁচিয়ে উঠলো, "কে? কে ওখানে উত্তর দাও নইলে গুলি করব।"

আমরা কোন উত্তর না দিয়ে পাগলের মতন দৌড়ালাম। কটা গুলি কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেক লোকের চেঁচামেচি, "ওইযে ওখানে, ওরা নদীর দিকে চলেছে। সবাই তাড়া কর, কুকুরগুলো খুলে দাও।"

কিছুটা দৌড়ে আমরা জঙ্গলে ঘন ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়লাম। ওরা আমাদের পেরিয়ে গেলে আমরা ওদের দলে মিশে গিয়ে ওদের সঙ্গে দৌড়াতে লাগলাম। কুকুর গুলো আমাদের শুকলো কিন্তু আমাদের চেনে বলে কোন রকম আওয়াজ করলে না। ক্রমে ক্রমে যখন ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান অনেকটা হয়ে গেছে ও কুকুর-গুলোর ডাক দূরে চলে গেছে, আমরা আমাদের 'ক্যানো' যেদিকে লুকানো আছে সেই দিকে এগিয়ে চল্লাম। ক্যানোয় উঠে জোরে দাঁড় বেয়ে আমাদের ভেলায় পৌঁছুতে খুব দেরী হল না।

ভেলায় উঠেই আমি বল্লাম 'জিম তুমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।' জিম বলে উঠলো "সত্যি হ্যাক এটা একটা বিরাট সাফল্য। টমের সুন্দর পরিকল্পনা কি উদ্ভেজনার মধ্যে ফলপ্রসূ হয়েছে চিন্তাই করতে পারা যায় না।"

আমাদের আর আনন্দ ধরে না, তবে টম সবচেয়ে আনন্দিত কারণ তার পায়ে একটা গুলি বিঁধেছে।

টম জেদ ধরলে আমরা যেন এক্ষুনি রওয়ান হই। কিন্তু জিম বল্লে, "আমি এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ছি না যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ডাক্তার এসে তোমার পা থেকে গুলি বার করে না দেয়।"

টম্ খুব গালাগালি শুরু করলে তাতে কিছু কাজ হল না। আমি ক্যানো নিয়ে সহরের দিকে চল্লাম ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার আসতে দেখে জিম যেন জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়, এই বলে অত রাত্রে ক্যানোয় আমায় উঠতে দেখে টম বল্লে আমি যেন ডাক্তারের চোখ বেঁধে এখানে নিয়ে আসি। ওর সব তাতেই দুঃসাহসিকতা। কাছেই একটা গ্রামে গিয়ে এক ডাক্তারকে ধরলাম। এত রাত্রে তাকে ওঠানোর জন্য বিশেষ খুশি হলেন না বটে তবে তিনি সত্যি খুব ভাল লোক। তাকে বানিয়ে বানিয়ে বল্লাম যে আমরা দুই ভাই ওই দূরের দ্বীপে শিকার করতে যাই। রাত্রে তাঁবুতে ঘুমুবার সময় আমার ভাই স্বপ্নে বোধ হয় পা ছুড়ে ফেলেছিল। পাশেই বন্দুকটা ছিল সেটা ছুটে যায় আর তা থেকে গুলি গিয়ে বিঁধে গেছে ভাই এর পায়ে। আমরা বাড়িতে জানাতে চাই না—। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথায় থাকি। ফেলপস্ এর নাম শুনে আমার সঙ্গে তাঁর ব্যাগ ও ওষুধ পত্তর নিয়ে চল্লেন। ক্যানোয় দুজনে যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। অগত্যা তাকে সব নির্দেশ দিয়ে আমি একটা তক্তার ওপর এপারে বসে রইলাম, তিনি দাঁড় বেয়ে একাই এগিয়ে গেলেন।

তক্তার ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই, যখন ঘুম ভাঙলো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে শুনলাম সে তখনও ফেরেনি। আমি আবার নদীর দিকে যাব ভাবছি এমন সময় আঙ্কেল সাইলাসের সঙ্গে মোড়ের মাথায় দেখা হয়ে গেল। তিনি খুব ব্যাগ্র সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সিড কোথায়, তোমার আন্টি ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন।" "আমরা পলাতক ক্রীতদাসকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। সিড এখুনি ফিরে আসবে, সে পোস্ট অফিস গেছে।"

আঙ্কেল সাইলাস আমাকে নিয়ে পোস্ট অফিস গেলেন। অবশ্য টমকে ওখানে পাবার কথা নয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আন্টি স্যালীর চোখে জল, তবুও আমাকে দেখে খানিকটা সামলে নিলেন, কিন্তু সিডের জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। কৃষকদের বাড়ির অনেক স্ত্রীলোক আন্টি স্যালীকে গত রাতের ঘটনা ফলাও করে বলছে, যেন একটা গোটা সৈন্য বাহিনী কাল এসেছিল ক্রীতদাসকে উদ্ধার করতে।

স্ত্রীলোকরা আলোচনা করতে থাকলো। আঙ্কেল সাইলাস বার কয়েক সহরে গেলেন সিডের সন্ধানে কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরলেন। রাত্রে আমার ভাল ঘুম হ'ল না। যতবার ঘুম ভেঙে গেল দেখি আন্টি জানলার কাছে একটা চেয়ারে বসে, তার চোখে ঘুম নেই।

(১৫) সমস্যার সমাধান

সকালেও সিডের কোন সন্ধান পেলেন না আঙ্কেল সাইলাস।

আন্টি তার দিদির ডাকে আসা চিঠি খুলতে যাবে এমন সময় গেটের কাছে কাদের আসতে দেখে তিনি চিঠি ফেলেই দৌড়ে গেলেন বাইরে। আমি চিঠিটা লুকিয়ে ফেল্লাম। বাইরে গিয়ে দেখি, টম্ আসছে সেই ডাক্তারের সঙ্গে একটা গদির ওপরে বসে। পাশে জিম, পরনে তার আন্টির সেই গাউন, তার হাত পেছন দিক দিয়ে বাঁধা, সঙ্গে অনেক লোক।

আন্টি স্যালী কাঁদতে শুরু করেছেন, ভেবেছেন টম বুঝি আর বেঁচে নেই। যখন টমের মুখে দু একটা কথা শোনা গেল, তখন আন্টি কিছুটা প্রকৃতস্থ হলেন। কয়েক জন টমকে কোলে করে ওপরে নিয়ে এল, সঙ্গে ডাক্তার আর আন্টি। যারা ভিড়ের মধ্যে ছিল তাদের কয়েক জন জিমকে এক্ষুনি ফাঁসি দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে। পরে অবশ্য এই স্থির হল আপাতত তাকে সেই পুরানো কেবিনেই বেঁধে রাখা হবে।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বাদে নিচে নেমে এসে সবাইকার সামনে আঙ্কেল সাইলাসকে বল্লেন, জিমের প্রতি যেন কোন রকম খারাপ ব্যবহার না করা হয়। তিনি বল্লেন জিমের সাহায্য ছাড়া টমের পা থেকে তার একার পক্ষে গুলি বার করা সম্ভব হত না। জিম টমের অবস্থা দেখে নিজে থেকে

লুকানো জায়গা থেকে নিজের স্বাধীনতা উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসে, সে ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারত।

কয়েক দিনের মধ্যেই টমের বেশ উন্নতি দেখা গেল। একদিন সকালে সে আমার সঙ্গে কথা বলছে এমন সময় অ্যান্টি স্তালী ঘরে ঢুকলেন। আন্টিকে দেখে টম আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "টম আমাদের ভেলা ঠিক আছে।"

"হ্যাঁ"

"জিম ?"

"হ্যাঁ জিম ঠিক আছে।"

তখন টম বলে উঠলো, আন্টিকে সব বলেছ ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বিষয়ে সিড ?" "কেন, এই সব ঘটনা। আমি ও তুমি কি করে জিমকে উদ্ধার করি।" এই বলে সে নিজেই কি নিঁখুত ভাবে জিমকে কেবিন থেকে মুক্ত করে তা ফলাও করে বল্লে। আন্টি স্তালী রেগে গিয়ে বল্লে, "তোমরা আর কক্ষনো জিমের ব্যাপারে নাক গলাবে না।"

টম আশ্চর্য হয়ে বল্লে, "কোন ব্যাপারে ?" "কেন ঐ পালাতক নিগ্রো ক্রীতদাসের ব্যাপারে !" টম খুব গম্ভীর ভাবে আমায় বল্লে, টম তুমি না বল্লে জিম ভাল আছে ! তাকে কি ছেড়ে দেওয়া হয় নি ?

আন্টি বল্লে "তাকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে, আর কখনো সে পালাতে পারবে না।"

টম বিছানা থেকে উঠে বসলে, তার চোখ দুটো লাল, উত্তেজনায় তার নাকের ফুটো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সে রেগে বল্লে "তাকে আটকে রাখার কারুর ক্ষমতা নেই। ওকে এক্ষুনি খুলে দাও। সে আর ক্রীতদাস নয়। মিস ওয়াটসন দু'মাস হল মারা গেছে। সে তার উইলে জিমকে মুক্ত করে দিয়ে গেছে।"

আন্টি বল্লে "তবে আগেই বলতে পারতে। এত কাণ্ড করে ওকে উদ্ধার করতে গেলে কেন ?"

"হ্যাঁ সেটা একটা কথা বটে। তবে আমি এর মধ্যে দুঃসাহসিকতার সঙ্কেত পেয়েছিলাম—একটা বিপজ্জনক অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেলাম—আরে একি আন্টি পলি !" আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি টমের অন্য মাসী আন্টি পলি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আন্টি স্তালী দিদিকে দেখে লাফিয়ে বুকে টেনে নিল। আমি চকিতে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়েছি। আন্টি পলি বল্লে, "টম তুই এখানে কি করছিস ?"

আন্টি স্তালী বলে উঠলো, "কি বলছ দিদি, ও তো সিড, টম তো এখানেই ছিল, এক মিনিট আগে ছিল।

"তুমি হাক্ ফিনের কথা বলছ ? হাক্ খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এস।" আমি বেরিয়ে এলাম। আন্টি স্তালীর মুখে চোখে বিস্ময়। তিনি বল্লেন, "তবে সিড ?"

"সে বাড়িতে। তোমার চিঠিতে যখন পড়লাম, টম ও সিড দু'জনেই খুব ফুর্তিতে আছে, তখনই বুঝেছি একটা কিছু চলছে, তাই তো এখানে চলে এলাম। তুমি আমার চিঠি পাও নি ?"

"কই না। তোমার কোন চিঠিই পাই নি।" আন্টি পলি টমকে বল্লে "টম এ তোমার কাজ, নিশ্চয়ই চিঠিগুলো রেখেছ। শীঘ্র বার করে দাও।"

টম তখন স্বীকার করলে সে পোস্ট অফিস থেকে চিঠিগুলো নিয়ে এসে ট্রাঙ্কে রেখেছে। তখন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

একটু পরেই জিমকে দেখতে গিয়ে দেখি, সে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে সবাই খুব ভাল ব্যবহার করছে। টম তাকে চল্লিশ ডলার পুরস্কার দিল সে আদর্শ বন্দীর মত ব্যবহার করেছে বলে।

এর পর টমের আনন্দ আর ধরে না, সে আবার একটা দুঃসাহসিক অভিযানে বার হবে। আমি বল্লাম আমার আর যাওয়া হয়ে উঠবে না কারণ হাতে কিছু টাকা নেই। প্যাপ্ নিশ্চয়ই জজ থ্যাচারের কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে থাকবে। সেই শুনে টম বলে উঠলো, "না তোমার প্যাপ আর ফেরেন নি, তোমার ৬ হাজার কেন আর কিছু বেশী টাকাই গচ্ছিত আছে জজের কাছে।"

জিম বলে উঠলো, "তোমার প্যাপ আর কখনই ফিরে আসবেন না হাক্।"

আমি বল্লাম, "কেন ফিরবেন না, একথা কেন বলছ ?" প্রথমে কিছুতেই বলতে চায় না পরে অনেক পীড়াপীড়িতে বল্লে তোমার কি মনে আছে জ্যাকশন দ্বীপের কাছে সেই বজরাটার কথা, যেটা কাত হয়ে পড়ে ছিল নদীতে ! ভেতরে একটা মৃত দেহ পড়েছিল, যার মুখ আমি ঢাকা দিয়েছি ও তোমায় দেখিতে বারণ কর, সেটা ছিল তোমার প্যাপের মৃত দেহ।"

টম সুস্থ হয়ে উঠেছে। পা থেকে বার করা গুলিটা সে একটা চেনের সঙ্গে বেঁধে গলায় পরে বেড়াচ্ছে। আর লেখার বিশেষ কিছু নেই। আন্টি স্তালী আমাকে পুস্তি পুত্র নিয়ে ভদ্র করতে চান, কিন্তু আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

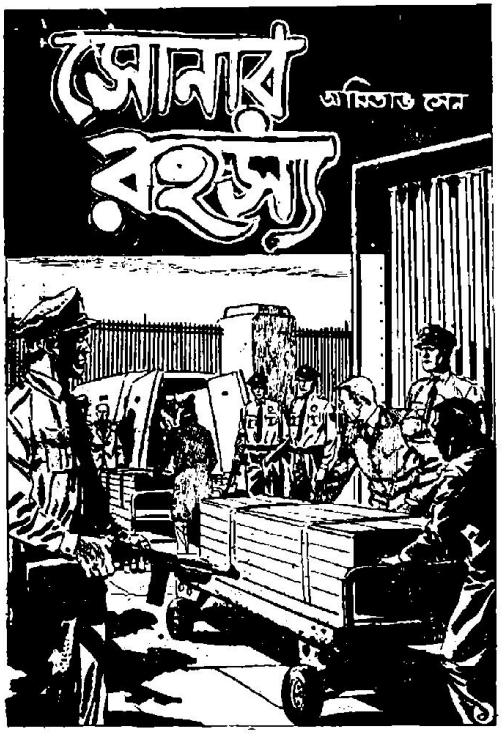

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুত সোনার সুরক্ষিত ভাণ্ডার ফোর্ট নক্স থেকে সোনা পাঠানো হচ্ছে, দুটো ভারী কাঠের পেটি করে।

পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা যাবে ফেডারেল ব্যাঙ্কে সশস্ত্র প্রহরায়।

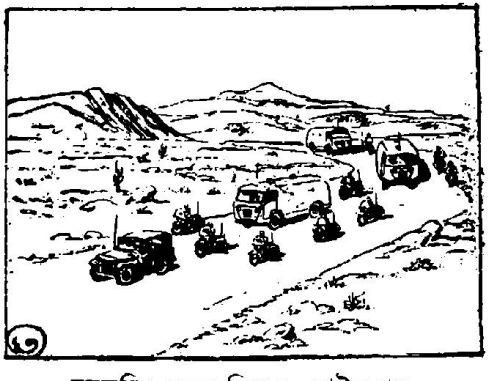

মরুভূমির ভেতর দিয়ে ৬০ মাইল পথ।

পাহাড়ের চূড়া থেকে বাইনোকুলার দিয়ে নজর রেখেছে একজন।

হাউইজার কামান থেকে ৪০ পাউণ্ড গোলা ছুটলো।

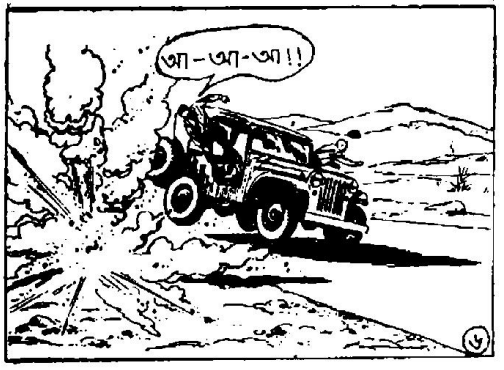

সামনের জীপের দশ গজ সামনে পড়লো প্রথম গোলা

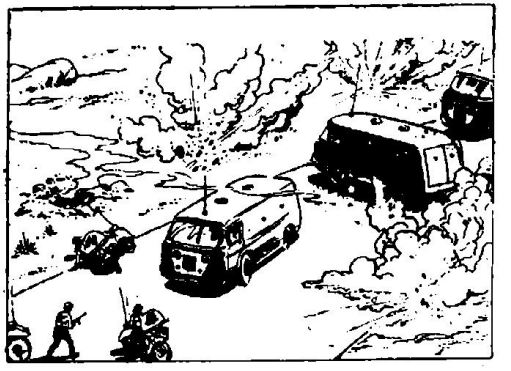

রাস্তার দুপাশে গোলা পড়ছে—কোন গাড়ির ওপর পড়েনি, কেউ আহত হয়নি।

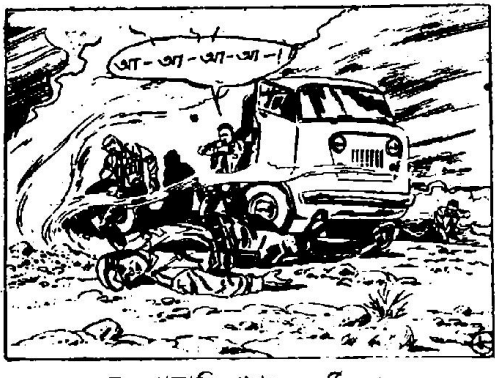

ঘুম পাড়ানি গ্যাসে ভর্তি শেল

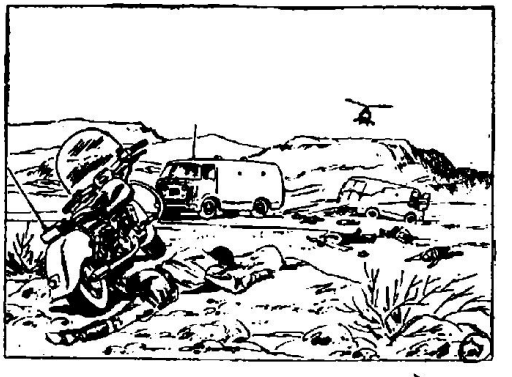

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কনভয়ের সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

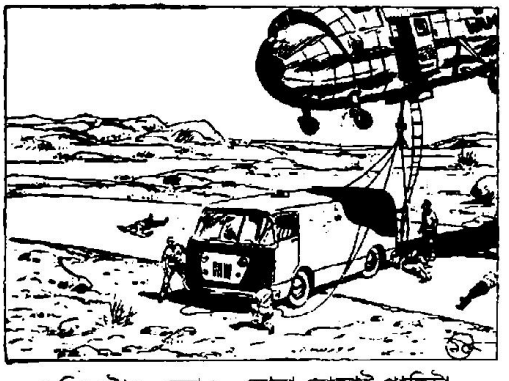

হেলিকপ্টার এলো। সোনা বোজাই গাড়িটা ইস্পাতের দড়ি দিয়ে বাঁধলো।

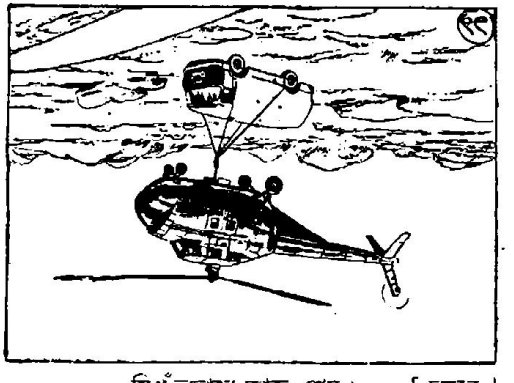

নিখুঁতভাবে কাজ শেষ। [চলবে]

(বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প)

সার সত্যপ্রকাশ ও মহাকাশ-বোম্বেটে

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত তিনদিন যাবৎ পৃথিবীর সব কটি মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরাই দিনরাতের প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট সেকেণ্ড পর্যন্ত উদ্‌বেগ আর অনিদ্রায় বসে ঠায় তাকিয়ে রয়েছে গবেষণাগারের বেতার যন্ত্রের দিকে একটি মাত্র সংবাদের প্রতীক্ষায়।

যে সংবাদটির আশা তাঁরা করছেন তার ওপরই নির্ধারিত হয়ে যাবে আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যৎ!

মহাকাশ থেকে সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পাঠাবেন আমাদের সেই অতি পরিচিত বিতর্কিত বিজ্ঞানী—সার সত্যপ্রকাশ।

সার সত্যপ্রকাশের কৌশল এবং পরিকল্পনার সার্থকতার ওপরই নির্ভর করছে আগামীদিনে পৃথিবীবাসীর টিকে থাকার শর্তগুলি। মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিন বুঝি সত্যিই কখনও আসে নি।

কিন্তু সংবাদটুকু আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

তবে কি সার সত্যপ্রকাশ কোন বিপদে পড়লেন? সর্বনাশা মহাকাশ-বোম্বেটেরা ধরে ফেলেছে তাঁর কন্দি কিকির?

ক্রমে দুশ্চিন্তায় মুখগুলো আমসির মত শুকিয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের। তাঁরা এবার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে বসে থাকেন।

বীপ্....বীপ্....বীপ্....পৃথিবীর প্রতিটি মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের বেতার-যন্ত্রগুলি হঠাৎ একই সঙ্গে সরব হয়ে ওঠে।

বেতার যন্ত্রের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বিজ্ঞানীরা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বেতার বার্তা গ্রহণ শেষ হয়ে গেল। তারপর বার্তা উদ্ধার করতেও কয়েক মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। তারপরই উল্লাসে ফেটে পড়লেন পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী রক্ষা পেয়ে গেছে মারাত্মক মহাকাশ-বোম্বেটেদের কবল থেকে। অসাধ্য সাধন করেছেন এক ভেজালের দেশের নির্ভেজাল বিজ্ঞানী মানুষ—সার সত্যপ্রকাশ।

কলকাতায় বসে খবরটা আমিও পেয়ে গেলাম টেলিগ্রাম মারফত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমার কাছে কিন্তু খবরটা খুব একটা বিস্ময়কর ছিল না।

সার সত্যপ্রকাশ যখন ব্যাপারটায় মাথা গলিয়েছেন তখন বুড়ো হাড়ে যে একটা ভেলকী দেখাবেন, এ বিশ্বাস আমার আগাগোড়াই ছিল। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষটা শুধু বিজ্ঞানী না হয়ে একজন গোয়েন্দা বা উকিল হলেন না কেন!

কিন্তু কাহিনীটা এভাবে শেষ থেকে শুরু না করে বরং গোড়ার কথায় ফেরা যাক।

ঘটনাটা প্রথম ঘটেছিল মাস দেড়েক আগে।

সেদিন সন্ধ্যে সাতটা মতো হবে। ঘরে বসে কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেখছিলাম। সুন্দর 'ভরত নাট্যম্' নৃত্য চলছিল। আচমকা অনুষ্ঠানটা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান কেন্দ্রের কোন যান্ত্রিক গোলোযোগ। কিন্তু একি! টি ভি র পর্দা জুড়ে ও কার মুখ ভেসে উঠলো? সম্পূর্ণ টাক মাথা, গোঁফ দাড়ি এমনকি ভ্রূর চুল পর্যন্ত নেই, খ্যাবড়া নাক, লম্বা, খাড়া কান, গোলগোল মমতাহীন দুটি চোখ, মোটা ঠোঁট—এ কোন্ জাতের মানুষ? এমন বিচ্ছিরি এবং ভয়ানক চেহারার ঘোষক তো কলকাতা দূরদর্শনের পর্দায় কোনদিন দেখি নি।

কিন্তু বিভ্রান্তি আরও বাড়লো। পরিষ্কার বাংলায় গমগম করে উঠেছে সেই আশ্চর্য ঘোষকের কণ্ঠস্বর: পৃথিবীবাসী মন দিয়ে শোন। আমি অন্য নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা, সম্প্রতি আমি আমার মহাকাশযান নিয়ে তোমাদের গ্রহের নিকটবর্তী একটি স্থানে আকাশ ঘাঁটি স্থাপন করেছি। এখন থেকে এই পৃথিবী গ্রহের একমাত্র অধিশ্বর এবং কর্তৃত্বের অধিকারী আমি এবং আমার অনুচরেরা। তোমাদের এমন কোন শক্তি বা অস্ত্র নেই যা আমাদের রোধ করতে পারে। অতএব সর্বপ্রথমে সমস্ত বিশ্ববাসীকে বিনা প্রতিবাদে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশ দিচ্ছি আমি।

শুনতে শুনতে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের এ কোন্ রসিকতা, নাকি নতুন ধরনের কোন এক্সপেরিমেন্ট?

সব জল্পনা কল্পনার অবসান হোল পরদিন সকালে সংবাদপত্র মারফত। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি জানিয়েছে আগের দিন ভারতীয় সময় সাতটা পাঁচ মিনিটে বিশ্বের সকল কেন্দ্রের টি ভি অনুষ্ঠানেই নাকি ছেদ পড়ে এবং টি ভি পর্দায় ভেসে ওঠে এক নিষ্ঠুর ভয়াবহ মানুষের মুখ। সেই মানুষটি সেই দেশের নিজস্ব ভাষায় যে বক্তব্য প্রচার করে, তা গত রাতে আমরাও শুনেছি আমাদের ভাষায়।

একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

কিন্তু ব্যাপার তখন সবে শুরু হয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই শোনা যেতে লাগল বিশ্বব্যাপী আরও সব আজব কাণ্ডকারখানার কথা।

সত্যিই নাকি পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার মাইলের মধ্যে আকাশ-ঘাঁটি গেড়েছে এক অজানা মহাকাশ-যান। জানা গেছে তার আরোহী মাত্র পাঁচজন। দেখতে প্রায় মানুষের মতো হলেও ওরা নাকি এসেছে দূর নক্ষত্রলোকের কোন এক গ্রহ-জগৎ থেকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের চেয়ে কয়েক হাজার বছর এগিয়ে থাকা সেই গ্রহজগৎ থেকে সম্ভবতঃ কোন কারণে বিতাড়িত এই মহাকাশ-বোম্বেটের দল স্পেস শিপ নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমণ করতে করতে হঠাৎ এই সুজলা সুফলা পৃথিবী গ্রহের সন্ধান পেয়ে এখানেই স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেইসঙ্গে পৃথিবীটাকে তারা দখল করে উপনিবেশ বানাতে চায়। সেই মহাকাশ-বোম্বেটেদের সর্দার তাই

সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলছে তাদের বশ্যতা স্বীকার না করলে যে কোন মুহূর্তে সে পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলকে অনায়াসে ধ্বংস করে দিতে পারে।

স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবীর শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রনায়করা প্রথমে ওই মহাকাশ বোম্বেটেদের হুমকিকে গ্রাহ্য করে নি। তারা শক্তিশালী মিসাইল এবং নানা পরমাণু অস্ত্র পাঠিয়েছিল ওদের ওই মহাকাশ-যান ধ্বংস করতে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের সৃষ্ট অতি শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাছাকাছি গিয়ে তো পৌঁছতেই পারলো না পৃথিবীর সেরা মারণাস্ত্র গুলো। বরং তার আগেই প্রতিটি অস্ত্রকেই মাঝ পথে ধ্বংস করে দিল ওই একটি মাত্র স্পেসশিপের আরোহীরা। মানুষের আধুনিকতম নিউক্লিয়ার মিসাইলও যেন ওদের কাছে খেলনা বন্দুকের গুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপরই মহাকাশ-বোম্বেটেরা তাদের শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করলো।

প্রথম আক্রমণটা এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরই! মার্কিন পেন্টাগনের টি, ভি, পর্দায় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা ভেসে উঠলো সেই কুটিল বোম্বেটে সর্দারের মুখ। রাষ্ট্রপতিকে হুমকি দিয়ে বললো, মাত্র চব্বিশঘণ্টার মধ্যে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ-বোম্বেটেদের তাদের প্রভু হিসেবে মেনে না নেয় তবে নাকি পরিণাম মারাত্মক হবে।

শোন কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অধুনা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর রাষ্ট্র নাকি এক অজানা স্পেসশিপের কয়েকটা মনুষ্য আকৃতি জীবের পদানত হবে! তারপর কি আর বিশ্বের কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে ওদেশের কোন মানুষের?

সুতরাং এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হোল— বাঁই বাঁই করে আবার কিছু অতি শক্তিশালী পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র পাঠান হোল হতচ্ছাড়া মহাকাশ যানটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু আগের মতোই এগুলোও তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারলো না। তার আগেই চুরমার হয়ে গেল মাঝপথে।

আর এর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যাবার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ 'গ্রেট সল্ট লেক' এর সমস্ত জল হঠাৎ বাষ্প হয়ে উড়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। এই আশ্চর্য ঘটনার কারণ কেউ খুঁজে পেল না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অবশ্য পেন্টাগনে টি. ভি. পর্দায় সেই মহাকাশ-বোম্বেটে সর্দারের কুটিল মুখটা আবার ভেসে উঠলো এবং জানাল, একাজ তাদেরই। তারা শুধু তাদের ক্ষমতার একটা ছোট্ট নিদর্শন এবার রেখেছে। আরও চব্বিশঘণ্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মসমর্পণ না করলে আরও বড় বিপর্যয় ঘটবে।

এবার আর উপেক্ষা নয়। মার্কিন কংগ্রেসের জরুরী অধিবেশন ডেকে সারা সন্ধ্যে, রাত্তির ধরে দফায় দফায় চললো নানা আলোচনা বৈঠক, বিশ্বাসী— অবিশ্বাসীদের মধ্যে রীতিমত তর্কযুদ্ধ বেধে গেল। কিন্তু এতবড় পরাজয় এভাবে মেনে নেবার পক্ষে মতামত বিশেষ পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে আরও চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে গেল এবং তারপর মহাকাশ বোম্বেটেরা তাদের ক্ষমতার পরবর্তী নিদর্শন রাখলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বে ফ্লোরিডা উপদ্বীপ এলাকায়। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একসঙ্গে প্রায় একশো মাইল জনবহুল এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একটা মানুষ, একটা গাছ কিংবা একটা

ঘরও টিকে রইলো না।

এরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মসমর্পণ করে মহাকাশ বোম্বেটেদের অধীনতা মেনে নিল।

একই পরিণতি ঘটলো কানাডা, মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্র গুলির ভাগ্যে।

অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধ থেকেই পৃথিবী জয়ের অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটিয়েছে ওই মহাকাশ বোম্বেটেরা তাদের মহাকাশযানে বসে।

পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির অবস্থা এখন সহজেই অনুমেয়। এত বছরে এত আলোচনা আর বক্তিমেতেও যা সম্ভব হয় নি রাতারাতি তাই হয়েছে—দলমত ভুলে সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভেদাভেদ মিটে গেছে। মহাকাশের অশান্তি এসে এক অভূতপূর্ব বিশ্বশান্তি করেছে প্রতিষ্ঠা। মস্কোতে বসেছে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ জরুরী অধিবেশন, তাতে আমন্ত্রিত হয়েছে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি? হাজার হাজার বছরের সভ্যতার পথ অতিক্রম করে এসে সমস্ত পৃথিবীবাসী শেষে কিনা বহির্জগতের এক স্পেসশিপের মাত্র জনা পাঁচেক বোম্বেটের কাছে পরাধীনতার দাসখৎ লিখে দেবে। আলোচনায় বাগবিতণ্ডা, উত্তাপ, হৃদয়াবেগ সব কিছুই প্রকাশ পেল—কিন্তু উদ্ধারের পথ কিছু দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে ইওরোপ ভূখণ্ডেও মহাকাশ-বোম্বেটেদের থাবা পড়তে শুরু করেছে।

শোনা গেল ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীও আত্মসমর্পণ করেছে। অবশ্য শেষ চেষ্টা করতে ওরা কেউ ছাড়ে নি। কিন্তু তার পরিণামে বেশ কিছু জনবহুল অঞ্চল ও কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ ঘটে গেছে। এই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে ওই সব দেশের ওপর নায়করা এতদিন যে সব প্রাণঘাতী অস্ত্রের গর্বে সর্বদা বুক ফুলিয়ে রাখতো সেগুলি স্রেফ দেয়ালীর ফুলঝুরি কিংবা 'কালীপটকার' বেশী কিছু নয়।

এরপরই রাষ্ট্রসংঘ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, পৃথিবীবাসীর তরফ থেকে সম্মিলিত ভাবে মহাকাশ-বোম্বেটেদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়া হবে। তাতে আর যাইহোক, নতুন করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নষ্ট হবার আশঙ্কা তো আর থাকবে না। দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে ওই দূর নক্ষত্রলোকের আগন্তুক মহাকাশ বোম্বেটেদের মূল উদ্দেশ্য এই গ্রহটাকে দখল করে হুকুমদারী চালান। খাস তালুকের প্রজাদের প্রাণে মেরে তো লাভ নেই। তা দুর্বল পক্ষকে বরাবরই সবলের পায়ের তলায় থাকতে হয়েছে—এতো পৃথিবীর ইতিহাসও বলে।

উভয়পক্ষে আলোচনার পর স্থির হোল পৃথিবীবাসীর তরফ থেকে এক দূত সন্ধিপত্র নিয়ে গিয়ে দেখা করবে মহাকাশ-বোম্বেটেদের সঙ্গে তাদের মহাকাশ ঘাঁটিতে গিয়ে। অবশ্য সে সন্ধিপত্র যে আসলে পৃথিবীবাসীর দাসখত তা তো বলাই বাহুল্য।

কিন্তু প্রশ্নটা উঠলো কে যাবে ওই মারাত্মক জীবগুলির কাছে! ওরা যদি রাগে পেয়ে বন্দী করে রাখে, কিংবা মাংসের পোর্মা বানিয়ে খেয়ে ফেলে? যেটুকু পরিচয় ওদের ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে স্বভাবে ওরা ভয়ানক হিংস্র।

এমনই এক অচল অবস্থার মধ্যে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটলো সেই বিতর্কিত ভারতীয় বিজ্ঞানী সার সত্যপ্রকাশের।

কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে নিজে হাজির হয়ে

উনি যখন মহাসচিবের কাছে নিজের ইচ্ছেটা জানালেন। মহাসচিব প্রথমটা পাত্তা দিতে চান নি, জানিয়েছেন কূটনৈতিক আলোচনা কিংবা যাতায়াতের ব্যাপারটা কোন বিজ্ঞানীর এক্তিয়ার ভুক্ত নয়—সম্পূর্ণই রাজনীতিবিদদের।

কিন্তু সার সত্যপ্রকাশ হাল ছাড়েন নি। মাত্র সাত মিনিটের জন্যে তিনি মহাসচিবের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকার চাইলেন। শেষপর্যন্ত হয়তো পরিস্থিতির জটিলতা মনে রেখে সেই সঙ্গে নিছক কৌতূহল বশেই মহাসচিব সম্মত হন।

এই গোপন সাক্ষাৎকার হোল রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরটিতে। এই সাক্ষাৎকারের মাঝে তৃতীয় কোন ব্যক্তি হাজির ছিল না এবং মাত্র সাত মিনিট সময় ধার্য হলেও ওদের গোপন আলোচনা চলে প্রায় একত্রিশ মিনিট আটাশ সেকেণ্ড। তারপর দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন যাকে বলে মুখে একেবারে তালা চাবি এঁটে। তবে মহাসচিবকে কেন কে জানে বেশ উৎফুল্লই মনে হচ্ছিল।

পরদিনই রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ অধিবেশনে মহাসচিব নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলেন মহাকাশ-বোম্বেটেদের আকাশঘাঁটিতে পৃথিবীবাসীর দূত হিসেবে যাবেন ভারতীয় বিজ্ঞানী সার সত্যপ্রকাশ।

সম্মানীত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের মহাসচিব কিভাবে সার সত্যপ্রকাশের যাওয়ার প্রয়োজনটা বুঝিয়ে ছিলেন তা বলতে পারবো না—তবে সার সত্য-প্রকাশের স্পেসস্যুট পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ মহাকাশযানে আরোহণ করে যাত্রা করার দৃশ্যটা সারা বিশ্বের টি. ভি. অনুষ্ঠানে দেখান হয়েছিল। আমিও দেখেছি। বৃদ্ধকে কিন্তু খুবই তাজা দেখাচ্ছিল মহাকাশযানের সিঁড়িতে উঠে পৃথিবী বাসীর উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো হাত নেড়ে ছিলেন সার সত্যপ্রকাশ।

কিন্তু এসব ঘটনা দিন কুড়ি আগের।

বস্তুতঃ সে যাত্রায় সার সত্যপ্রকাশ মহাকাশ বোম্বেটেদের স্পেসশিপে গিয়েছিলেন তাদের হাতে বিশ্ববাসীর তরফ থেকে দাসত্বের স্বীকারোক্তি তুলে দিতে।

ফিরে এলেন দিন দশেক বাদে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাকাশযান পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক এবং রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা তাঁকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে চাইলো—কি দেখলেন ওদের স্পেসশিপ বা মহাকাশযানে ঢুকে? কি অভিজ্ঞতা হোল? ওরা কি শুধু দাসখৎটুকু লিখিয়ে নিয়েই পৃথিবীটাকে রেহাই দিতে রাজী হয়েছে নাকি অন্য কোন মতলব আছে? পৃথিবীটাকে ওরা মানুষ শূন্য করে দেবে না তো? সার সত্যপ্রকাশ সকলকে শুধু একটা কথাই বললেন—আর কটা দিন ধৈর্য ধরুন, আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

সবাই যখন নাছোড়বান্দা হয়ে বললো—অন্ততঃ একটু ইঙ্গিত তো দেবেন?

সার সত্যপ্রকাশ এবার হেঁয়ালি করে বললেন—দিন দশেক বাদে ওদের আকাশ-ঘাঁটিতে আর এক বার আমায় যেতে হবে। প্রকৃত মীমাংসা হবে তারপর।

—কিসের মীমাংসা?

—পৃথিবীর সত্যিকারের ভবিষ্যত কি! কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে সার সত্যপ্রকাশ আর দাঁড়ান নি।

সেই উত্তর এতদিনে পাওয়া গেছে।

মহাকাশ বোম্বেটেদের আকাশ-ঘাঁটি মহাকাশযান

থেকে বিশ্বের মহাকাশ কেন্দ্রগুলিতেও বেতারবার্তা পাঠিয়েছেন সার সত্যপ্রকাশ। পৃথিবী শুধু এযাত্রা রক্ষাই পায়নি সেই সঙ্গে মহাকাশ-বোম্বেটেরা সমূলে বিনাশ হয়েছে। সার সত্যপ্রকাশ ওদের মহাকাশ-যানে প্রবেশ করে দেখেছেন পাঁচজন বোম্বেটের প্রাণহীন দেহই পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে।

এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড কি করে সম্ভব হোল? পাঁচ জন জবরদস্ত আকাশ-বোম্বেটে একই সঙ্গে মারাই বা গেল কি করে?

সে উত্তর পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দিয়েছেন সার সত্য-প্রকাশ।

তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর।

পৃথিবীর কেউ যা পারে নি তা সম্ভব করেছেন সার সত্যপ্রকাশ একা। গ্রহান্তরের মহাকাশ-বোম্বেটে দের মরণ ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন সেই প্রথমবার ওদের ঘাঁটিতে গিয়েই—ওদের সম্পূর্ণ অজান্তে।

ব্যাপারটা আর একটু খোলাখুলি লিখি—

যদিও মহাকাশ-বোম্বেটেরা পৃথিবীর দূত সার সত্য-প্রকাশকে নিজেদের আকাশঘাঁটি মহাকাশযানে প্রবেশ করতে দেবার আগে সার সত্যপ্রকাশের স্পেসশিপে রোবট রক্ষী পাঠিয়ে সার সত্যপ্রকাশের আনাচে কানাচে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল যে কোনরকম আক্রমণের প্রস্তুতি কোথাও নেই—তবু সার সত্যপ্রকাশ সেই অভিযানেই সেই পাঁচ মহাকাশ-বোম্বেটেদের যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। সত্যি বলতে কি, যে গ্রহান্তরের জীবেরা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে ইতিমধ্যেই হত্যা করেছে এবং সারা বিশ্ববাসীকে সেই পাঁচ উন্মাদের ক্রীতদাস বানাবার সর্বনাশা চক্রান্ত করেছে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। সেই মৃত্যুর পরোয়ানাই প্রথমবার প্রকৃত পক্ষে সার সত্যপ্রকাশ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মহাকাশযানে।

কিন্তু কি ভাবে?

একাজ বুঝি সার সত্যপ্রকাশের মতো বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব!

গ্রহান্তরের ওই নৃশংস দুর্ধর্ষ মনুষ্য আকৃতির জীব-গুলিকে পৃথিবীর চূড়ান্ত শক্তিশালী মারণাস্ত্রগুলিও এতটুকু বিচলিত করতে না পারলেও সার সত্য প্রকাশ পেরেছিলেন বুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগে।

মহাকাশ-বোম্বেটেদের পাঠান রোবট পৃথিবী-প্রেরিত মহাকাশযানে এবং সার সত্যপ্রকাশের দেহ তল্লাশী করেও যে মারণাস্ত্রের সন্ধান পান নি, আসলে তা ছিল রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে পাঠান আত্মসমর্পণের লেফাফাটির মধ্যেই অতি সূক্ষ্ম আকারে।

তা হলো এক ধরনের মারাত্মক ভাইরাস বা বিষাণু। সার সত্যপ্রকাশ অত্যন্ত গোপনে লেফাফাটির মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 'হারপেস এনকেফেলাইটিস' জাতীয় কিছু ভাইরাস মহাকাশ-বোম্বেটেদের জন্যে। মারাত্মক এই ভাইরাস বা বিষাণুর আক্রমণে মস্তিষ্কের অংশবিশেষ ফুলে ওঠে, শুরু হয় অসহ্য জ্বালা এবং পৃথিবীর শতকরা ৭০ জন মানুষই মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে পাগল হয়ে যায়। পৃথিবীর মানুষকে যদি তার পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এবং তার শারীরিক কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সত্ত্বেও এত ক্ষতি করতে পারে তবে ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এ জাতীয় কোন আক্রমণের প্রতিরোধক্ষমতাহীন দেহধারী সেই গ্রহান্তরের মহাকাশ-বোম্বেটেদের শরীরে এ ভাইরাস চরম ক্ষতি করতে সক্ষম তা

কি অন্য মানুষ মানের অপেক্ষা রাখে ?
মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সেই পাঁচজন মহাকাশ দস্যু একে একে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে।
দ্বিতীয় বার সার সত্যপ্রকাশ আবার সেই মহাকাশ ঘাঁটিতে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁর পরিকল্পনার সার্থক রূপটি দেখতে এবং তা দেখার পরই সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রনেতাদের বেতার সংকেত পাঠিয়ে জানিয়েছেন পৃথিবীর রক্ষা পাওয়ার কথা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আগাগোড়া জানতেন শুধু এক জন ব্যক্তি—তিনি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব। গোপন আলোচনায় একমাত্র তাঁকেই সার সত্যপ্রকাশ কৌশলটা খুলে বলেছিলেন। শুনে তিনি উৎসাহিত হন এবং স্বাভাবিক নিরাপত্তার কারণেই তখনকার মতো পরিকল্পনাটা গোপন রাখতে সম্মত হন।

এরপরও অবশ্য প্রশ্ন উঠেছিল—ওই মারাত্মক ভাইরাস বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সার সত্যপ্রকাশ নিজেও তো আক্রান্ত হতে পারতেন। যতদূর জানা গেছে ওই বিষাণু অত্যন্ত দ্রুত এবং নিভুল ভাবে মানুষের শরীরের কোষে বাসা বেঁধে আঘাত হানতে পারে।

সার সত্যপ্রকাশ অবিচলিত ভাবেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। সম্প্রতি এই ভাইরাস প্রতিরোধ এবং ধ্বংসের কাজে এক রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে—নাম 'এ্যাডেনাইন আর-বিনোসাইড'। এই ওষুধটি যথাকালে সার সত্য প্রকাশ নিজের শরীরে প্রয়োগ করে আগে থেকেই রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করে রাখেন।

বিশ্বের প্রতিটি টি. ভি. পর্দায় সকল দেশের মানুষই সার সত্যপ্রকাশের পৃথিবী প্রত্যাবর্তন এবং রাষ্ট্র-সংঘের তরফ থেকে তাঁর রাজসিক সম্বর্ধনার দৃশ্যটা দেখলো। কিন্তু এত সম্বর্ধনা, প্রশস্তি, মাল্যদান সব কিছুর মধ্যেও মানুষটি আশ্চর্য নির্বিকার। পরদিন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সংবাদ পত্রগুলিতেই ওর একমাথা রুক্ষ চুল আর ঝাঁটা গোঁফওলা ফোকলা মুখের ছবি বেরুলো, সেই সঙ্গে ওঁর একটাই বক্তব্য : আমি একজন মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্যটুকু মাত্র করেছি। ইতিমধ্যেই মহাকাশ-বোম্বেটেদের হাতে যে কয়েক লক্ষ নরনারী নিহত হয়েছে আজ তাদের কথাই আমার সব থেকে বেশী মনে পড়ছে।'
সাংবাদিকদের কাছে একথা বলার সময় নিশ্চয় ওই বৃদ্ধ বিজ্ঞানসেবী মানুষটার চোখ দুটোয় অশ্রু টলমল করে উঠছিল। ওঁকে যে আমি অনেক বেশী আপন করে জানি।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর আজই সকালের ডাকে সার সত্যপ্রকাশের একটা চিঠি পেয়েছি। রাজস্থানের রতনপুরে নিজের গবেষণা-গারে ফিরে গিয়ে আমায় লিখে পাঠিয়েছেন :
"প্রিয় স্বপন,
আশাকরি ভাল আছ এবং সাম্প্রতিক বিশ্ব সংকটের সকল ইতিবৃত্তই অবগত আছ। তুমি আমার স্নেহভাজন, তাই এই সঙ্গে আরও একটা সংবাদ তোমায় চুপি চুপি না জানিয়ে পারছি না, তা হোল গ্রহান্তরের মহাকাশ-বোম্বেটেদের সেই আশ্চর্য আকাশযানটাকে গত দুদিন আগে আমি আমার গবেষণাগারের কাছাকাছি অঞ্চলে নামিয়ে আনতে পেরেছি। ওটা নিয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানই উদ্দেশ্য। যদি দেখার ইচ্ছে থাকে চটপট চলে এস।

শুভেচ্ছান্তে

ইতি—
তোমাদের
সার সত্যপ্রকাশ"

চিঠি পড়েই লাফিয়ে উঠেছি। দেখার আবার ইচ্ছে নেই! বলে গত কয়েক বছর আগে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বেশ কিছু প্যাটন ট্যাঙ্ক দখল করে তারই মধ্যে ভাঙা চোরা একটা কলকাতায় আনা হয়েছে, সেটা দেখতেই ঘণ্টা চারেক ঠাই লাইন দিয়েছি—আর এতো গ্রহান্তরের এক জলজ্যান্ত স্পেসশিপ!
ভাবছি আগামী কালই ট্রেনে চাপবো॥

—×—

কবরের বাসিন্দা

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা। নিজে যদিও ভূতপ্রেতে বড় একটা বিশ্বাস করিনা, সেকালে ভৌতিক গল্প লিখতাম। কারও ভালো লাগতো, কেউ বা গাঁজা-খুরি বলে উড়িয়ে দিতো। কবর থেকে উঠে এসে মানুষ-ভ্যাম্পায়ার অন্য মানুষের রক্ত শুষে নিচ্ছে, চাঁদনী রাতে মানুষ নেকড়েবাঘ হয়ে ছুটে যাচ্ছে বনে-জঙ্গলে, নিশুতি রাতে নিশির ডাক শুনে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষ ঘর ছেড়ে শ্মশানের দিকে হাঁটছে —এসব ছোটরা যতো সহজে মেনে নেয়, বড়রা তেমন অনায়াসে বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তাছাড়া আমি পেশায় ডাক্তার। বিজ্ঞান যা মানেনা, আমি তা লিখলে বন্ধুরা হাসাহাসি করবেই।

তবু বছর পাঁচেক আগে কোন একটা বাংলা রহস্য পত্রিকায় ছাপা-হওয়া আমার একটা ভৌতিক গল্প এক হিসেবে আমার জীবনটা বদলে দিয়েছিল। আজকের গল্প সেই গল্প নিয়েই।

'মরণের পরে' বা 'কঙ্কাল'-এর পর ভৌতিক গল্প নিয়ে বাংলা সিনেমা বড় একটা দেখিনি। সিনেমায় ভৌতিক কাহিনীর বিশেষ একটা আবেদন আছে। 'হরর অফ ড্রাকুলা' পড়তে যতো না ভয় লাগে, সিনেমার পর্দায় দেখলে তার থেকে অনেক বেশী লাগে। ভৌতিক গল্প নিয়ে নতুন ফিল্ম করার একটা পরিকল্পনা ছিল সেকালের নামজাদা চিত্রপরিচালক অতীন সেনের। আসল নামটা ইচ্ছে করেই বলছিনা। উনি এখনও ফিল্ম-লাইনেই আছেন, তবে ভৌতিক কাহিনী নিয়ে আর মাথা ঘামাননা।

আমার গল্পটা ওঁর পছন্দ হয়েছিল। স্টুডিওর পরিবেশ আমার কাছে নতুন। চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারটা আরও নতুন। গল্পের ভূত আর চিত্র-নাট্যের ভূত আলাদা, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। সংলাপ, পরিবেশ—সবকিছু দর্শকের চোখে ও মনে আতঙ্ক জাগাবে। কাজটা সহজ নয়।

এরই মধ্যে অতীনবাবু একদিন আমায় নিয়ে গেলেন একটা ভৌতিক ফিল্ম দেখাতে। দক্ষিণ কলকাতার একটা হলে মুন-শোতে তেলেগু, তামিল বা মালয়ালম ফিল্ম দেখানো হয়। এই ফিল্মটা মাত্র দুদিন আগে রিলিজ হয়ে এরই মধ্যে হৈ-চৈ তুলেছে দর্শকমহলে।

মালয়ালম্ ফিল্ম। সংলাপ বুঝিনা। তবে গল্প বোঝা যায়।

(পরের অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়)

গোয়েন্দার ধাঁধাঁ

উৎপল ভট্টাচার্য

চরিত্র :

সম্রাট দত্ত—গোয়েন্দা

ধীমান সেন—ঐ সহকারী

বাড়ির কর্ত্রী

সুধন্যকুমার—ধনী এবং নামী চলচ্চিত্রের নায়ক।

হারাধন দাস—ঐ ভাগনে।

কণ্ঠস্বর।

দৃশ্য : রাজা বসন্ত রোডে গোয়েন্দার বাড়ির বৈঠকখানা। বাবার আমলের আসবাব-পত্রে ঘর সাজান। এককোণে টেবিলের ওপর টেলিফোন।

(কথা বলতে বলতে সম্রাট এবং ধীমানের প্রবেশ।)

ধীমান : যাক। এই ব্যাপারটার তো নিষ্পত্তি হল।

সম্রাট : হ্যাঁ। (বাঁদিকের আরাম কেদারায় বসতে বসতে) ভেবে দেখো! এবারো সেই বাড়ির চাকর বা রান্নার ঠাকুর, যাই বল, —সেই অপরাধী হল!

ধীমান : যা বলেছ! (ডান দিকের চেয়ারে বসে) আমিতো ভাবতেই—(টেলিফোন বেজে উঠল।) হ্যালো?

কণ্ঠস্বর : বাঁচান!

ধীমান : অ্যাঁ! কি বলছেন?

কণ্ঠস্বর : সাহায্য করুন। বাঁচান।

ধীমান : একটু খুলে বলুন! কোত্থেকে ফোন করছেন?

কণ্ঠস্বর : দয়া করে বাঁচান!

সম্রাট : (ধীমানকে) কি বলতে চাইছেন ভদ্রমহিলা, ভাল করে শুনে নাও!

ধীমান : মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার কথার স্টক কম। খুলে কিছুই বলছেন না।—শুনুন! বরং একটা চিঠি লিখবেন, বুঝেছেন? (ফোন নামিয়ে রাখল)। নতুন কেস মনে হচ্ছে।

সম্রাট : অন্য প্রদেশের মহিলা মনে হল। কোন ফ্ল্যাট বাড়ির একেবারে উঁচু তলার ঘর থেকে কথা বলছিলেন মনে হয়।

ধীমান : (অবাক বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে সম্রাটের দিকে তাকাল) সম্রাট! আমার এই উনিশ বছর হল। তোমার সাকরেদীও করছি গত ন'বছর। তোমার কাজকর্মের ধারা আমি বেশ জানি। কিন্তু কি করে তুমি উঁচু তলার ঘর থেকে

ফোন করছেন মহিলা, এটা বুঝলে ? বাঙ্গালী যে নন্ সে তো আমিও বুঝেছি।

সম্রাট : অত অবাক হয়ো না। আমার এই পঁচিশ বছরের চৌদ্দ বছরই গোয়েন্দাগিরি করে কাটল। বাংলা জানেন না সেটা যেমন বুঝলে, গলার স্বর কিরকম হাল্কা অথচ তীক্ষ্ণ, সেটা লক্ষ্য করনি। যত উঁচুতে উঠে কথা বলবে, দেখবে স্বর পাতলা আর তীক্ষ্ণ, হয়ে যাবেই— বায়ুর অবস্থান বিবেচনা কর !

(বাড়ির কর্ত্রী ঢুকলো)

কর্ত্রী : একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন। নাম হারাধন দাস।

সম্রাট : ভেতরে নিয়ে এসো।

(কর্ত্রী বেরিয়ে গিয়ে একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে আবার ঢুকলেন। ভদ্রলোকের হাতে, মাথায়, পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং দু' বগলের নীচে ক্রাচ, তাতে ভর করেই একপায়ে হাঁটছেন।)

সম্রাট : আসুন ! বসুন, হারাধনবাবু। অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলেন বুঝি ?

হারাধন : ঠিক ধরেছেন। ধরবেনই তো। সেজন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি।

সম্রাট : বেশ তো। সব খুলে বলুন ! একেবারে গোড়া থেকে।

হারাধন : আমার নাম হারাধন দাস। সুধাংশুকুমারকে তো চেনেনই। আমি তার ভাগ্নে। মামার সঙ্গেই থাকি। যদিও আমার দাদু ব্যারিস্টার অক্রুর সেনও আছেন, মানে ছিলেন।

সম্রাট : হ্যাঁ। উনি তো কদিন আগেই মারা গেলেন ?

হারাধন : তাই বটে ! তবে বেশ সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে। মরবার কিছুদিন আগেই উনি একটা উইল করেন। আর সেটা জানার পর থেকেই মামা, সুধাংশুকুমার আপনাদের, দাদুর ওপর অত্যাচার শুরু করলেন। একদিন পেছন থেকে দাদুর ঘাড়ে ধাক্কা মারলেন উনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। আর একদিন যখন দাদু বাগানে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছিলেন, সেই সময় ব্যালকনির ওপর থেকে একটা ইয়া বড় পাথরের ফুলদানী দাদুর ওপর ফেললেন মামা। তা, এগুলোও না হয় দৈবাৎ দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলাম—

সম্রাট : তা তো বটেই।—

হারাধন : তারপর একটা ঘটনা ঘটল, যেটাকে আমি কিছুতেই দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। একদিন রাতে, দাদুর ঘর থেকে একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে, পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে চাবির ছিদ্রে চোখ রাখলাম। মামাকে দেখতে পেলাম। মামা দাদুর গলায় একটা মোটা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে, দড়ির প্রান্তটা সিলিং ক্যানের আংটার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। টেনে ধরলেই—ব্যস। বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটির পর দেখি মামা ক্রমশঃ দড়িটার একপ্রান্ত টেনে নামাচ্ছে আর ফাঁসটা দাদুর গলা ঘিরে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

আমার মনের সন্দেহটা এবার বেশ দৃঢ় হল।

সম্রাট : তা আপনার দাদু—মিঃ সেন, ছেলের সঙ্গে লড়লেন না? বাধা দিলেন না?

হারাধন : খুবই চেষ্টা করলেন প্রথম প্রথম। তারপর দম না পেয়ে ক্রমশঃ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

সম্রাট : হুঁ। ধীমান কি মনে হচ্ছে?

ধীমান : আমার বিশ্বাস উইলের শর্তে বঞ্চিত হয়েছেন বুঝতে পেরে সুধন্যকুমার তার বাবা অক্রুর সেনকে খতম করে দিতে চেয়েছিলেন।

সম্রাট : অত ঝপ্ করে সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় আমাদের, ধীমান। (হারাধনকে) এর পরেই তো আপনার দাদু, মিঃ সেন মারা যান?

হারাধন : আজ্ঞে হ্যাঁ। মানুষটাই কেমন যেন বদলে গেলেন দাদু, এই ঘটনার পর থেকে।

সম্রাট : আপনার মামা কি উইলে ফাঁকি পড়েছেন?

হারাধন : নিশ্চয়ই! দাদু তার সব টাকা পয়সা আমাকে দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে, সবই মামার প্রাপ্য হবে।

সম্রাট : আর তখন থেকেই আপনার ওপর আক্রমণ হচ্ছে?

হারাধন : ঠিক তাই। একের পর এক আক্রমণ চলছেই। ভারী কাঠ মাথার উপর ছুঁড়ে দিচ্ছেন; বাথরুমে বোমা ফাটছে; খাবারে আর্সেনিক বিষের গন্ধ পাচ্ছি; ঘুম থেকে উঠে রোজই দেখি মশারীর বাইরে বিষধর সাপ ফোঁস ফোঁস করছে! আর আজ সকালে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামতে গিয়ে দেখি পুরোনো আমলের কাঠের সিঁড়ির অর্ধেকটাই কেটে ফেলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার উপায় নেই।

সম্রাট : হারাধনবাবু! এসব ঘটনা যখন ঘটেছে তখন কি আপনার মামাকে কখনও ধারে কাছে দেখেছেন?

হারাধন : আলবাৎ। প্রত্যেকবার দেখেছি। হয় কোণের দিকে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নয়তো আলমারী বা ডেস্কের পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখছেন।

সম্রাট : সেই সময়ে তার মুখের ভাবটাব লক্ষ্য করেছেন?

হারাধন : তাও করেছি বৈকি। প্রথমে প্রত্যাশায় উজ্জ্বল মুখ, তারপরেই, যখন আমি বেঁচে গেলাম, মামার মুখটা হতাশায় ভরে গেল।

সম্রাট : হুঁ! বুঝলাম! আচ্ছা, ঠিক করে বলুন তো হারাধনবাবু, আপনার মতে, আপনাকে খুন করার পেছনে, আপনার মামার কোন উদ্দেশ্য আছে?

হারাধন : না। তেমন কিছু নয়, কেবল অনেক টাকা পাবেন, এইমাত্র।

সম্রাট : ভাল কথা! আপনি একটু বসুন! আমি ভেতর থেকে আসছি! ধীমান! এঁকে একটু চা-টা খাওয়াও ততক্ষণ!

[সম্রাট বেরিয়ে গেল।]

হারাধন : [ধীমানকে] উনি কোথায় গেলেন?

ধীমান : [হাসল] শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন! আপনার মামা সুধন্যকুমারের ছদ্মবেশে আপনার সামনে আসবেন।

হারাধন : [অবাক হয়ে !] তাতে কি লাভ হবে ?

ধীমান : আমার মনে হয়, যত দাগী আসামী আছে, তাদের ডেকে কথা বলবেন। যদি তারা পরিচিতের মত কথা বলে ছদ্মবেশী সম্রাটের সঙ্গে, তাহলে বোঝা যাবে যে বদমাইসদের সঙ্গে আপনার মামার আঁতাত আছে।

[বাড়ির কর্ত্রী ঢুকলো]

কর্ত্রী : [উত্তেজিত স্বরে] একটা লোক ড্রেন-পাইপ বেয়ে ওপরে উঠছে। দুদিকে দুটো পিস্তল ঝুলছে তার কাঁধ থেকে। চামড়ার বেল্টে বাঁধা !

ধীমান : খবরটা দিয়ে ভালই করেছ। আমি দেখছি। [কর্ত্রী বেরিয়ে গেল।] গোয়েন্দার জীবনে আরাম নেই, দেখছেন তো ?

হারাধন : যদি একডজন লোক হামলা করে এক-সঙ্গে, তাহলে কি করবেন ?

ধীমান : ওঃ কিছু না। চারজন করে তিনটি বাণ্ডিলে বেঁধে ফেলব।

(সুধন্যকুমার বাঁদিক দিয়ে ঢুকলেন। দু হাতে তার দুটো পিস্তল।)

সুধন্য : হা ! এইবার তোকে বাগে পেয়েছি, হারামজাদা হারাধন ! [ধীমানের দিকে তাকিয়ে] এই বাঁদরটা আবার কে ? থাক গে। দুজনেই মাথার ওপর হাত তোলো ! নইলে দুই গুলিতে দুই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব !

হারাধন : ছাখ, মামা। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ—

ধীমান : [হো-হো করে হেসে উঠে] আরে, ইনি আপনার মামা নন, হারাধনবাবু ! (সুধন্যর দিকে তাকিয়ে) তোমার ছদ্মবেশের কোন তুলনা নেই, সমুদা

হারাধন : তার মানে ? আপনি বলতে চান ইনি মামা নন ? সম্রাটবাবু ?

ধীমান : গোয়েন্দা সম্রাট দত্ত ! আপনার মামার ছদ্মবেশে।

হারাধন : অসম্ভব ! অবিশ্বাস্য ! কিন্তু তার গলার স্বর—পোশাক—আর মামা তো প্রায় চার ইঞ্চি বেশী লম্বা—

ধীমান : জানি ! সব আগে থেকে ভেবেই ঠিক করি আমরা। তাই না, সমুদা ?

সুধন্য : কি আজেবাজে বকছিস্ রে ছোঁড়া ? সমু-দা কে ? ও-হো, দাঁড়া ! বুঝেছি ! ওই নকল গোঁফ, ঢলঢলে পোশাক পরে ক্লাউন সেজেছে—সেই লোকটা বুঝি ? তোর গোয়েন্দা দাদা সম্রাট দত্ত ? আর তাই ভাবছিস—আমিই তোর সমুদা ? অ্যাঁ ! ভাল কথা। তবে শোন ! সে ব্যাটা—আমার পেছনে ড্রেন পাইপ বেয়ে উঠছিল। তাকে ঘরে আমি রান্নাঘরের বড় আলমারিতে বন্দী করে রেখেছি।

হারাধন : খুব ভাল করেছেন, স্যার ! ওই হারাম-জাদাই সুধন্যকুমার—আমার মামা।

সুধন্য : হ্যাঁ ! লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত। তবে আমিও ধূর্তের শিরোমণি, বুঝলি ?

ধীমান : বুঝেছি, সমু-দা। তাকে নজরে রাখতে হবে। তাই তো ?

সুধন্য : ঠিক তাই। তোদের সাহায্য এখন দরকার। আয় আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান। একটু পরেই চাবি হাতে সুধন্যর প্রবেশ]

সুধন্য : যাক। এই দুটো মর্কটকেও আলমারিতে

বন্ধ করে দিয়েছি। এইবার বাড়ির ঐ কর্ত্রী ঠাকরুণকে বাগে আনতে হবে। [টেবিলের ওপর বেল বাজাল] এটাকেও আলমারিতে ঢোকাতে হবে। [কর্ত্রী প্রবেশ করল] মাথার ওপর দু হাত তোলো, বাছা। [পিস্তল তাক্ করে ধরল সুধন্য।]

কর্ত্রী : তা নয় তুললাম। তারপর কি করবেন ?

সুধন্য : তোমাকেও আলমারিতে বন্ধ করে বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেব। আমার পেছনে লাগা বার করে দেব! হাত তোলো!

কর্ত্রী : অত ধমকাবেন না সার। পেছনে চেয়ে দেখুন! পুলিশের লোক জানলা দিয়ে ঢুকছে —

সুধন্য : কি ? (পেছন দিকে ঘাড় ফেরাতেই কর্ত্রী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সুধন্যর হাতের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে তারদিকেই তাক্ করে ধরল।)

কর্ত্রী : (হেসে) এমন একটা বহুচেনা, বাজে ধোঁকা খেয়ে গেলেন, সার! আপনি এলাইনে একেবারে নতুন মনে হচ্ছে!

সুধান্য : [গম্ভীর স্বরে] পিস্তলে গুলি ভরা নেই।

কর্ত্রী : তাই না কি ? দেখি। [বলেই সুধন্যর মাথার ওপর দিয়ে দুবার ফায়ার করল।] মাপ করবেন, সার। আপনার ধারণা ভুল। সত্যিকার গুলিভরা।

সুধন্য : [মুখে দুহাত চাপা দিয়ে] ঠিক আছে— ঠিক আছে—

কর্ত্রী : আমি গোয়েন্দা বাড়ির কর্ত্রী, ভুলে যাবেন না, স্যার। এবার চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলবেন চলুন!

সুধন্য : অসম্ভব! তার মানে তো আমি ধরা পড়ে গেলাম!

কর্ত্রী : ঠিক কথা, সার!

সুধন্য : তাহলে আমার কি হবে ? অনেক ছবির শুটিং বাকী!

কর্ত্রী : সেগুলো আর হবে না, সার! তার আগেই গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়তে হবে আপনাকে! চলুন! [আগে সুধন্য, পেছনে পিস্তল হাতে কর্ত্রী বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই সবাইকে মুক্ত করে নিয়ে ফের মঞ্চে ঢুকলো।]

[সম্রাটের ঠোঁটের ওপর বাঁদিকে আধ-খানা গোঁফ ঝুলছে। পেছনে ধীমান আর হারাধন।]

সম্রাট : [গোয়েন্দা সুলভ স্বরে] সুধন্যকুমার। আপনার খেলা শেষ। অনেক টাকা রোজগার করেও অপব্যয়ের জন্য ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছেন আপনি। এখন ভাগ্নেকে মেরে টাকা জোগাড়ের ধান্দা। নিজের বাবাকে তো মেরেছেনই। আমাকেও খুন করতে চেয়েছেন। এখন পুলিশে যান। ধীমান!

কর্ত্রী : আমি আগেই ফোন করে দিয়েছি। [দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ] ওই পুলিশ বুঝি এল! আমি যাই। [প্রস্থানোদ্যত]

সম্রাট : আমাদের জন্য একটু কফি পাঠিয়ে দিও। উফ্! গোয়েন্দাগিরি বড়ই ক্লান্তিকর কাজ।

[ফোন বেজে উঠল]

ধীমান : [ফোন তুলে কানে লাগাল]

কণ্ঠস্বর : বাঁচান! দয়া করে বাঁচান। সাহায্য করুন।

ধীমান : [সম্রাটকে] আবার সেই মহিলার ফোন। এবার একসঙ্গে তিনটে কথা বলছে। কিন্তু কোথায়—কি বৃত্তান্ত ?

সম্রাট : ফোন রেখে দাও! আমি ঠিক খুঁজে নেব। এদিকে এসো। এই যে কফি এসে গেছে!—[কফির কাপে দীর্ঘ চুমুক।]

মায়ের স্মৃতি

কিন্নর রায়

এক ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠলে চোখের সামনে কেমন যেন কুয়াশা কুয়াশা মনে হয়। একটু ঝাপসা ঝাপসা সব কিছু।

বরষা প্রায় শেষ হোয়ে এলো। এখনই প্রায় গাছ বোঝাই শিউলি ফুটছে। লাল্লু জমাদার শিউলিকে বলে হর-কি-শিঙ্গার' গাছকে বলে পেঁড়। রোজ সকালে সাফাই করতে আসে লাল্লু। নর্দমা, বাড়ির উঠোন ঝাঁটা দিয়ে বুলিয়ে যায়। সবুজ ঘাসের ওপর হলুদ বোঁটাঅলা সাদা সাদা ফুলেরাও ঝাঁটার গায়ে জড়ো হয়। এখন ফুল কুড়োবার কেউ নেই।

পাতা আর গোলাপি ফুলে হৈ-হৈ ব্যাপার। খুব ঝাপড়ালো গাছ। কেটে দিলেও বাড়ে। তুতা তাকিয়ে থাকে।

এখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। কেউ বোলতে ভাই আর দিদি। বাবার রেলের চাকরি। নাইট ডিউটি চলছে এখন। ফিরতে ফিরতে সেই বেলা বারোটা একটা।

তুতা মাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। ওর বুকের তলায় শিরশির করে। ও জানে কোন গোলমালের আগে মা এসে দাঁড়ায়! জানিয়ে দিয়ে যায় সামনে বিপদ। সাবধানে থাকিস।

শিউলি গাছের পাশে মা। মায়ের গা ছুঁয়ে একটা নতুন দিন আসছে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে খুব আবছা কালো শাড়িতে আগুন্ রঙের পাড় বসানো। সূর্য উঠছে। একটা দুটো কালো পাখির ফুটকি ঢাকাই শাড়ির বুটি হোয়ে যায়। ভোরের কেমন যেন আলাদা গন্ধ।

এই আবছা সকালে তুতা মাকে দেখতে পায়। মায়ের গোটা গাটাই কুয়াশা কুয়াশা। যেন মেঘের তৈরী। ভেসে ভেসে আসে। খুব হাল্কা। শিউলি গাছ, মাধবীলতার ঝোপ, তারপাশে মা। কি যে নিখুঁত ছবি।

মাধবীলতায় এখন উপচে পড়ছে ফুল। শিউলি

সবুজ ঘাস ছোঁয়। কেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে কুয়াশা কুয়াশা মা। যেমন জলে দেখা ছায়া ঢিল পড়লে হয়। ধূপের ধোঁয়ার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় মা। আকাশে সূর্য উঠে আসে।

থুম হোয়ে বোসে থাকে তুতা। আকাশের রং

এখন ফাগুন রাঙা বেনারসীর মতো। মাধবীলতার ঝাড়ে হাওয়া লাগে। পাতা দোলে, ফুলও। মা রোজ বিকেলে ডালশুদ্ধ মাধবীলতা এনে ছ'কোণা টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রাখত। শিউলি কুড়িয়ে ছোট চুপড়িতে। আরও কত ফুল। কত গন্ধ, স্মৃতি। এখন মা নেই। ফুলেরা শুধুই ঝরে যায়।

তুতা ভাবে কেন এলো মা। সেই বছর চারেক আগে যখন খুব বন্যা হোলো, তার আগে আগে মা এসেছিলো। এমনিভাবে। তারও পরে যেবার তুতার হাত ভাঙলো সাইকেল থেকে পড়ে, সেবারেও। এবারেও কি ...।

দিদি ঘুম থেকে উঠে কলতলা হোয়ে এলো। ওর গালে গলায় পোখরাজের দানার মতো জল। চোখ থেকে ঘুমের কাজল এখনও মোছেনি। মাথায় খুব চুল দিদির। মায়েরই মতো।

তুতার কথা কেউ বিশ্বাস কোরবে না। সবাই বোলবে, তুই বড্ড ভাবিস তুতা। মনে আছে, খুব ছোটবেলায় ও একবার বোলেছিল, আমি হাওয়া দেখতে পাই। সে শুনে সবায়ের কি হাসি ঠাট্টা। সত্যি সত্যি তুতা এখনও আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পায় খুব ছোট ছোট বৃত্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যখানে বিন্দু। আলাদা ঘুরছে। কখনও মালা হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান বই পরিষ্কার বলে দিয়েছে, হাওয়া দেখা যায় না।

ভীড় রাস্তায় একা হাঁটতে হাঁটতে তুতার মনে হয় কেউ যেন তাকে চেনা গলায় ডাকছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলে কেউ নেই। এগিয়ে গেলে আবার সেই ডাক শোনে। এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কাউকে বলা যায় না।

সারা দিনটাই কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে যায় তুতার। ঘুম ঘুম ভাব। চারপাশে সবই আবছা আবছা। কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়। সামান্য মাথা ধরে। মা এর আগেও যখন এসেছে, একই অবস্থা তখন। তারপর ঘটনা ঘটে যাবার পর যে-কে সেই।

এমনটি হোলে কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। খালি শুয়ে থাকতে মন চায়।

আবছা দিনটা কেমন কেটে যায়। রোদ্দুর বাথরুমের দেওয়াল ছোঁয়। চারটে বাজে। রোদ আর এক বেগদা ওপরে উঠলে বোঝা যাবে এখন বিকেল সাড়ে চারটে। একটা দোয়েল পোকা আর কেঁচো ধরার জন্যে এদিক ওদিক করে।

এই রোদ্দুরে হাওয়ায় মা এসে দাঁড়ায়। মরু ভূমির মরীচিকার মতো। আস্তে কাঁপে। হাওয়ায় হারিয়ে যায়। মরে গেলে মানুষ নাকি বদলে যায়। মায়ের বেলায় তেমন হয়নি। সেই রকম সাদাসাপ্টা শাড়ি পরা, বড় একটা সিঁদুরের টিপ। হাসিমাখা মুখে গাম্ভীর্যের দাঁড়ি। তুতার মাথার ভিতর চিন চিন করে।

সারাদিনরাত্তির কারুর সঙ্গেই তেমন কথা বলেনা তুতা। ইস্কুলের পড়া হয় না। বাবা দিদি ভাই সবাই যেন কেমন দূরের। দিনরাত মা-ই আসে কেবল।

দুই ॥

আইনুদ্দি বড় মজার লোক। আরও মজার ওর পাঁজরা বের করা বেতো টাট্টু পংখিরাজ।

কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি চালাতো আইনুদ্দি। পংখিরাজ টানত। জোড়ার আর একটা কবেই মরেছে, মাথা বোঝাই কাঁচা পাকা চুল, পাকানো দড়ির মতো চেহারার আইনুদ্দি খুব মজার মজার গল্প বলে। সবই পংখিরাজ আর তার গাড়ি নিয়ে।

ইট রঙের পংখিরাজ কান খাড়া কোরে কথা শোনে। কখনও চিঁ-হিঁ ডাক ডেকে ওঠে। এখন বালি স্টেশনে রিক্সা টানে আইনুদ্দি। ঘোড়ার গাড়ির সেই কাঠের ঘরটা ওর বাড়ির উঠোনে পড়ে থাকে। একটাও চাকা নেই। গায়ে পেতলের কাজ নেই। ছাদের তক্তাও দুচারখানা কোরে খুলে নিচ্ছে আইনুদ্দি। ভেতরের বসার গদী অনেক দিন হাওয়া।

তবু ওই ঘোড়ার গাড়ির ঘর আইনুদ্দির মতো রহস্যময়। ওর ভেতর বোসে যেন অনেক গল্প শুনতে পায় তুতা। ওর বয়েসি বছর বারো তেরোর ছেলেরা যখন মাঠে ফুটবল নিয়ে দাপায়, তখন আইনুদ্দি তুতাকে বলে চাঁদের আলোয় পংখিরাজ কেমন হেসে ওঠে। কেন হাসে। পালিয়ে যায় দূরে। দূ—রে। রেলমাঠে। আসলে মজা দেখতে ওর দড়ি নিজের হাতেই খুলে দেয় আইনুদ্দি।

ভাঙাচোরা লোহালক্কড়, রেলওয়ে স্লিপারের পাশে সবুজ গালচের মতো ঘাস হয় রেলমাঠে। ওখানে ভাঙা ইটের বেড়া টপকে পংখিরাজ ভেতরে ঢোকে। পেট ভরে ঘাস খায়। এখানে তার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করার কেউ নেই। এই শেষ বরষায়, শরতের আগে পংখিরাজ ফিবছর হাওয়া হোয়ে যায়। একদিন দুদিন ফেরেনা। রেললাইন, ডোবা, রেলমাঠের ভাঙা দেয়াল, কাঠের স্লিপার, ঘাস বোঝাই মাঠের ওপর জ্যোৎস্না চুঁয়ে যায়। সেই মাঠে বুনো ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়ায় পংখিরাজ। তার রং বদল হয়।

রেল লাইনের পাড়ে একলাই থাকে আইনুদ্দি। জ্যোৎস্না রাতে সে মাঝে মাঝে লাইনে উঠে আসে। রহস্যময় চোখে দেখে পংখিরাজকে। কখনও ঘাস খায়। কখনও ডেকে ওঠে। আইনুদ্দির ভালো লাগে। ফিরে আসতে ডাকে না।

এসব কথা আইনুদ্দির মুখে শোনা। পংখিরাজের সব ডাক বুঝতে পারে আইনুদ্দি। নানান গল্প বলে।

…দিন দুই পংখিরাজ আইনুদ্দির বাড়ি নেই। চাকা খোলা বুড়ো গাড়ির ভেতর বোসে তুতা আবার মাকে দেখতে পায়। এখন বেলা প্রায় নটা। বাড়িতে ভালো লাগছে না তুতার। বাবা হাওড়া থেকে রেলগাড়ির সঙ্গে গেছে কাল রাতে। টিকিট চেক কোরবে। ফিরতে ফিরতে বেলা বারোটা একটা। আইনুদ্দি রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে একটু হেঁটে এই গাড়িতে বসা। ভালো লাগে।

হঠাৎ পংখিরাজের গলা শোনে তুতা। খুব খুশির ডাক। চটকা ভেঙে মায়ের কুয়াশা কুয়াশা গায়ের পাশ দিয়ে লাফ দিয়ে নামে। লাফাচ্ছে পংখিরাজ। খুব যেন আনন্দ তার। হাওয়ায় কেশর ফোলে। তুতাকে পংখিরাজ ডাকে। একটু ছুটে আবার দাঁড়ায়। তুতাকে দেখে ঘাড় বেঁকিয়ে দৌড়ায়।

তুতা বলে, পংখি, শোন তোর সঙ্গে কথা আছে। দাঁড়া। পংখিরাজ কথা শোনে না। ঘোর ঘোর চোখে তুতা দৌড়ায়। হাঁক ধরে। মাটি আর রাস্তা ধরে রেল লাইনের পাশ দিয়ে অনেকখানি দৌড়ে রেল লাইনের ওপর উঠে। আসতে চায় না সেই ঘোড়া। চকচকে রেললাইন যেন তুতাকে ডাকে।

পংখিরাজের কেশর টেনে ধরে একটা কুয়াশায় তৈরী হাত। নজর কোরে দেখে তুতা ভয়ংকর হোয়ে উঠেছে পংখিরাজের মুখ। দুচোখ যেন আগুনের গোলা। দাঁত আর জিভ বেরিয়ে আসে বুঝি। বিকট রক্তহিম করা চিৎকার পংখিরাজের

গলায়। কুয়াশা কুয়াশা হাত পষ্ট হয় আরও। কাঁপা কাঁপা শরীরের মা হাওয়ায় ভাসে। যেন কুয়াশা রঙের প্রদীপ শিখা। মা পংখিরাজের কেশর ধরে হিড় হিড় কোরে টানে।

তুতার দুচোখে বড্ড ঘুম। মাথার মধ্যে নাগর-দোলা। চোখ জুড়ে আসে। রেললাইনের পাশে ঘাসের ওপর ও গা এলিয়ে দেয়।

...বাড়িতে অনেক লোক। ডাক্তারবাবু, বাবা, ভাই, আইনুদ্দি। বন্ধুরা। ঘোর লাগা কানে তুতা শুনতে পায় কে যেন বোলছে, পংখিরাজ মারা গেছে রেলমাঠে। ...সাপে কেটেছে। ... পেটফেট ফুলে গেছে নাকি। ...পচা গন্ধে টের পেয়েছে সবাই।

তুতার বুকে শেষ বিকেলের রোদ বুক থেকে মুখে। এক টুকরো মেঘ সূর্যের চোখে লেপ্টে যায়। তুতা বোঝে মা এখন মেঘ। কোত্থেকে একফোঁটা জল ওর গালে এসে পড়ে। মা কি কাঁদছে? আনন্দে কি কেউ কাঁদে।

তুতার মনে হয় খুব কাছে থেকে ফিসফিসে গলায় মা যেন বোলছে, তুতা, ভয় পাস নি তো? ভয় কি, আমি তো আছি।

THE EMPIRE JUTE COMPANY LIMITED.

8, Old Court House Street, Calcutta-700001

Gram : JUTEMPIRE
CALCUTTA

Phone Nos. : 22-0698
23-8467
23-7148

Manufacturers of :—

Hessian Cloth. B. Twills, Twine, Etc.

Mills at :—

15, B. T. Road, Talpukur, Titaghur, 24-Parganas.

Phone : BKP 181 & 182.

হারানো উট

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

রাজামশাই রেগে খাপ্পা!

শুধু খাপ্পা নয়, আহাম্মক মন্ত্রীকে তিনি তাড়িয়েও দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। মন্ত্রীও কোন কথা বললে না, মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। রাজামশাইকে বড় ভালোবাসতো সে। তাই তাঁর কাছ থেকে অমন ব্যবহার পেয়ে মনটা তার খুবই খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে সে যখন জানতেও পারল না তার দোষটা কি।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল মন্ত্রী, ছেড়ে এল রাজ্যের এলাকা। সামনে বিস্তীর্ণ মালভূমি। ক্ষুণ্ণ মনে মন্ত্রিমশাই পথ চলছে তো চলছেই। চারদিকে শুধু বালি, বালি আর বালি, হঠাৎ তার নজরে পড়ল সেই বালির ওপর কতকগুলো পায়ের ছাপ। ছাপগুলো উটের পায়ের। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছে সে, এমন সময় তার দেখা হয়ে গেল দুজন লোকের সঙ্গে। দেখে সওদাগর বলেই মনে হয়। তাদের দিকে এগিয়ে গেল মন্ত্রী। বলল, আমার মনে হচ্ছে, তোমরা বোধ হয় তোমাদের উটটাকে হারিয়ে ফেলেছো। তাই কি?

সওদাগর দুজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ঠিক তাই। আমরা উটটারই সন্ধান করছি।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, উটের ডান চোখটা কি কানা?

হ্যাঁ, কানা।

বাঁদিকের একটা পা কি তার খোঁড়া?

হ্যাঁ, খোঁড়া।

সামনের একটা দাঁত কি তার ভেঙে গেছে?

হ্যাঁ, ভেঙে গেছে।

উটটার একদিকে মধু, আর একদিকে গম ছিল কি?

আশার আলোয় ঝলমল করে উঠল সওদাগর দুজনের চোখ। বলে উঠল, অবিকল তাই। বল না ভাই, উটটা কোথায় আছে?

কি করে বলবো কোথায় আছে!—মন্ত্রী বলল, আমি তো তোমাদের উটটাকে চোখেই দেখিনি। তোমাদের কাছেই শুনলুম, উটটা তোমাদের হারিয়ে গেছে।

দেখো নি!—সওদাগর দুজন যেন একটু রেগে গেল মনে হল: একথা বিশ্বাস করতে বল আমাদের? শুধু গম বা মধু নয়, উটের সঙ্গে মূল্যবান কিছু পাথরও ছিল। শিগগির বলো সেগুলো কোথায়? নইলে—

আমি তোমাদের উটের সন্ধানও জানি না। মূল্যবান পাথরের খবরও বলতে পারব না।

সওদাগর দুজন আরো রেগে গেল। তারা সোজা গিয়ে হাজির হল রাজার কাছে, তাঁর দরবারে।

সব কথা শুনে বলল রাজামশাইকে, এবং এও বলল যে, ওই মন্ত্রীই তাদের উটটাকে চুরি করেছে।

এ কি!—বলে রাজামশাই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন মন্ত্রীর খোঁজে। মন্ত্রী এলে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সওদাগর দুজনের উটটাকে তুমি চুরি করেছো?

আজ্ঞে না মহারাজ।—মন্ত্রী বলল, চুরি করা দূরের কথা উটটাকে তো আমি চোখেই দেখিনি।

রাজামশাই বললেন, চোখেই দেখো নি তো উটের সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানলে কি করে?

মন্ত্রী বলল, আমি বালির ওপর উটের পায়ের কতকগুলো ছাপ দেখে জানতে পারলাম। আমার মনে হল, উটটা বোধ হয় হারিয়ে গেছে, কেননা বালির ওপর কোন মানুষের পায়ের ছাপ ছিল না।

রাজামশাইয়ের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। বলে উঠলেন, আশ্চর্য! তারপর?

উটটার ডান চোখটা যে কানা, বুঝতে পারলাম এই দেখে যে, রাস্তার বাঁ-দিকের ঘাসগুলোই শুধু খাওয়া-খাওয়া। উটটার বাঁদিকের একটা পা যে খোঁড়া, সেটা জানতে পারলাম যখন দেখলাম তার বাঁদিকের পায়ের একটা-একটা ছাপ খুব অস্পষ্ট।

রাজামশাইয়ের গোল চোখ আরো গোল হয়ে গেল। মন্ত্রী বলে চলল, সামনের একটা দাঁত যে তার ভাঙা, ছেঁড়া ঘাসগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেটা। ভাঙা দাঁতের অংশে যে ঘাসগুলো পড়েছে, সেগুলো গোটাই রয়ে গেছে। রাস্তার ওপর গমের দানা পড়েছিল কিছু কিছু। পিঁপড়ের দল একটা একটা করে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। তাতেই আমি বুঝলাম, উটের পিঠের একদিকে গমের বস্তা ছিল। রাস্তার অপর দিকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর ওপর অনেক মাছি আমার চোখে পড়ল। বুঝতে আমার অসুবিধে হল না যে, একদিকে যেমন গম, উটের অপর দিকে তেমনি মধুর হাঁড়ি ছিল, আর সেই হাঁড়ি থেকেই চুঁয়ে চুঁয়ে মধু পড়েছে রাস্তায়।

মন্ত্রীর কথা শুনে খুশিতে রাজামশাই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন প্রায়। বলে উঠলেন, তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে গেছ সব। তোমার দৃষ্টি এবং বুদ্ধির আমি তারিফ করছি। তুমি সত্যিই একজন গুণী লোক। তোমাকে আবার আমি আমার মন্ত্রীর পদে বহাল করলাম।

পরক্ষণেই সওদাগর দুজনের দিকে তাকিয়ে রাজামশাই বললেন, মন্ত্রীর মুখে যে চিহ্নগুলোর কথা শুনলে, সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে তোমরা উটটার সন্ধান করো—পেয়ে যাবে নিশ্চয়।

রাজামশাইয়ের কথামত সওদাগর দুজন তাই করল। বলা বাহুল্য, তারা তাদের উটটাকে খুঁজেও পেলো মন্ত্রীর বলে দেওয়া চিহ্ন লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে।

উটটা কিন্তু বেশিদূর এগিয়ে যায় নি তখনো। তার পিঠের বোঝা যেমন ছিল তেমনই আছে। খোয়া যায় নি কোন কিছুই॥

নীল মাকড়সা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

খবরের কাগজে সংবাদটা দেখেই দুজনে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ওরা দুজন—অর্থাৎ অভ্র আর দীপ।

দুজনেই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। দুজনেই সমবয়স্ক আর দুজনেরই অ্যাডভেঞ্চারের দিকে অস্বাভাবিক টান। অতএব দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও অটুট আর অতিমাত্রাতেই। বন্ধুরা আড়ালে ওদের ডাকে অভ্রদীপ বলে এক নামেই।

'খবরটা দেখেছিস?' অভ্রই কথাটা বললো।

'নাতো? পড় শুনি', দীপও ঝুঁকে পড়লো।

খবরটা এই রকম:

'বিহারের পালামৌ এলাকায় কদিন যাবৎ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে। পালামৌর বিরাট অরণ্য এলাকাতেই ঘটনাগুলো ঘটেছে। কয়েকদিন আগে দুজন কাঠুরিয়া কাঠ কাটার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে প্রবেশ করলে তাদের আর ফিরে আসতে দেখা যায়নি। পরে অনুসন্ধানের ফলে তাদের মৃতদেহ জঙ্গলের এক ফাঁকা জায়গায় পাওয়া যায় —দেহ একেবারে নীলবর্ণ। এরপর আরও দুজন মানুষও ওই ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এই রহস্যময় মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এরপর আরও কয়েকজনের নিদারুণ এক অভিজ্ঞতা হয়। জানা যায় জঙ্গলের ওই এলাকায় নীলবর্ণ একধরনের মাকড়সা দেখা গেছে। ডাক্তারদের এবং পুলিশেরও ধারণা ওই মাকড়সার কামড়েই ওইসব মৃত্যু ঘটেছে। মাকড়সাগুলি নাকি দারুণ বিষাক্ত —অথচ এধরনের মাকড়সার কথা কোনদিন শোনা যায়নি। সব ব্যাপারটাই তাই খুবই রহস্যময়। তদন্ত চলছে।'

'কি বুঝলি?' অভ্র খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললো।

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। কি হতে পারে ভাবছিস?' দীপ বললো।

'নীল মাকড়সার কথা তো কোনদিন শুনিনি। আর লোকগুলোর দেহও নীল হবার কারণ কি কে জানে।'

'তাহলে?'

'তাহলে একটাই কর্তব্য—দুই বন্ধুর পালামৌ গমন': অভ্র বলে উঠলো।

'রাঙামাসীকে আজই তবে চিঠি লিখে দিচ্ছি রাঁচিতে। ওখানেই দুজনে উঠবো। আর মেসোমশাইতো আছেনই', দীপ বললো।

'তাহলে বাড়িতে জানিয়ে দিই, কি বলিস?' অভ্র বললো।

একদিন সকালে রাঁচি স্টেশনে নেমে দাঁড়ালো ট্রেন থেকে অভ্র আর দীপ। বাড়ির অনুমতি পেতে অসুবিধা হয়নি—অবশ্য রাঙামাসীর বাড়িতে বেড়াতে যাবে বলেছিলো দীপ, সঙ্গে বন্ধু অভ্র।

মেসোমশাই নিজে স্টেশনে এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে। দীপের এই মেসোমশাই অদ্ভুত মানুষ। এককালে স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন—বড় শিকারীও। খুব সাহস আছে তাঁর। আর অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারে অভ্রদের দারুণ উৎসাহ দেন।

গাড়িতে যেতে যেতে তিনি বললেন,' তাহলে দীপ, রাঁচিতে শুধু বেড়াতে আসা হলো, না অ্যাড-ভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছো?'

হাসলো দীপ, 'আপনিই বলুন না মেসোমশাই।'

'নীল মাকড়সা।' গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন মেসোমশাই।

অভ্র আর দীপ একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

'কি করে বুঝলেন, মেসোমশাই?' অভ্র জানতে চাইলো।

'ছয়ে আর ছয়ে চার। খবরের কাগজে পালামৌ-এর খবর কদিন খুব হৈ-চৈ তুলতেই তোমাদের চিঠি, অতএব—।'

'আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা?' দীপ বললো।

'গুরুতর কিছুই হবে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওখানকার পুলিশ অফিসার আমার বন্ধু। কাগজে যা লিখেছে তার ওপরেও অনেক কথাই শুনেছি। যেমন, চারজন লোকেরই পায়ে খুব ছোট্ট কামড়ানোর দাগ দেখা গেছে—অতএব ওই মাকড়সার মতো কিছু কামড়েছিলো তাদের। অথচ, মাকড়সা কামড়াতে পারে কখনও শুনেছো? কিন্তু তোমরা কি করবে ঠিক করেছো?

'আমরা পালামৌ গিয়ে দেখতে চাই', দীপ বললো।

'কিছু ভেবেছো এ সম্বন্ধে?'

'হ্যাঁ, আপনার কথায় বুঝতে পারছি, ধরুন, যারা মারা গেছে তারা সবাই গরীব মানুষ। অতএব ধরা যায় তারা খালি পায়ে জঙ্গলে ঢুকেছিলো', অভ্র বলে উঠলো। 'তাই মাকড়সা তাদের পায়ে কামড়েছে শরীরের অন্য কোথাও নয়। অতএব পা ঢাকা কোনো কিছু পরে আমরা জঙ্গলে ঢুকতে পারি।'

'চমৎকার বলেছো। এজন্য গামবুটই চমৎকার কাজ দেবে,' মেসোমশাই বললেন। 'আচ্ছা, তারপর?'

'ওই মাকড়সা ধরার চেষ্টা করবো'; দীপ জানালো।

'ঠিক। আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি,' মেসোমশাই বললেন।

সবাই ততক্ষণে বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলো।

দুটো দিন এবার বেশ হৈচৈ করেই কাটলো অভ্র আর দীপের। ওরা স্থানীয় কাগজও পড়ে নিলো ইতিমধ্যে।

মেসোমশাইর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ঠিক হলো পরদিন ওরা পালামৌ বেড়াতে যাবে। মেসোমশাই নিজে গাড়ি চালাবেন, অভ্র আর দীপ ছাড়া সঙ্গে থাকবে ওদের বাহাদুর নামে খুব সাহসী এক নেপালী ছেলে। রাঙামাসীমাকে বলা হলো অবশ্য বেড়াতে যাওয়ার কথাই, না হলে তিনি কিছুতেই যেতে দিতেন না।

রাঁচিতে এখন বেশ ঠাণ্ডা। গাড়ি ঠিক সময়ে ছাড়লো ওদের। সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারে মুরগীর মাংস আর পাউরুটি আর ফ্লাস্কে নেয়া হলো গরম কফি। মেসোমশাই তার রাইফেলও সঙ্গে নিতে ভুললেন না। তিনজনের জন্য গামবুটও রইলো।

দুপাশের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে সবাই এগিয়ে চললো। রাঁচি থেকে হাজারীবাগ হয়ে গাড়ি অন্য পথে চলবে।

'কিভাবে কাজ শুরু করবে ঠিক করেছো, দীপ?' মেসোমশাই গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন।

'প্রথমে আমরা কোথায় যাবো, মেসোমশাই?' দীপ প্রশ্ন করলো।

'প্রথমে থানায় গিয়ে ওদের অনুমতি নিতে হবে, যদিও আমি থানা অফিসারকে জানিয়ে রেখেছি।' 'আগে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছে ঘটনার কথা শুনতে হবে', দীপ বললো।

'ঠিক বলেছো। তারপর আজকের দিন বিশ্রাম। সার্কিট হাউস বুক করে রেখেছি, আরামে থাকা যাবে। আমরা কাল ভোরবেলা জঙ্গলে ঢুকবো', মেসোমশাই বললেন।

উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ পার হয়ে অভ্ররা এবার এসে পৌঁছলো অরণ্যময় পাহাড়ি পালামৌ অঞ্চলে।

বেলা প্রায় দশটা। ওরা শেষ পর্যন্ত সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছলো। সুন্দর ব্যবস্থা। মালপত্র নামানো হতেই মেসোমশাই থানায় চললেন অনুমতি নিতে। উৎসাহ তাঁরই যেন সবচেয়ে বেশি।

অভ্র আর দীপ দারুণ খুশি হলো এই ফাঁকে স্থানীয় কারো কারো সঙ্গে দু'একটা কথাবার্তা বলে নেবে বলে।

সার্কিট হাউসের চৌকিদার লোকটিকে পাকড়াও করলো ওরা। লোকটি মাঝবয়সী, নাম শিউপুজন। অভ্রই শুরু করলো।

'আচ্ছা শিউপুজন, তুমি ওই নীল মাকড়সার কথা শুনেছো?'

'হাঁ, হুজুর। বড়ি ভয়ের কথা—চার আদমী খতম হয়ে গেলো।' সে জবাব দিলো।

'কোন জায়গায় এটা হয়েছে?' দীপ প্রশ্ন করলো।

'এখান থেকে দু'মাইল হবে, হুজুর। জঙ্গল কা অন্দর।'

'ওরা সকালে সেখানে ঢুকেছিলো?' অভ্র বললো।

'জী হাঁ।'

কথাবার্তা বলার ফাঁকে মেসোমশাই ফিরে এলেন।

'অনুমতি পাওয়া গেছে', তিনি বললেন।

প্রাতরাশ শেষ করার পর বাহাদুরকে রেখে তিনজন এবার সার্কিট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

নানা মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অভ্রদের ধারণা হলো সকলেই খুব ভয় পেয়েছে, কেউ সহজে জঙ্গলে ঢুকতে চায় না। মেসোমশাই উপদেশ দিলেন কেউ যেন খালি পায়ে সেখানে না যায়।

রাতটা বেশ উত্তেজনার মধ্য দিয়েই কাটলো। ঠাণ্ডাও বেশ ওখানে। চারদিকে গভীর অরণ্য আর পাহাড়।

পরদিন ভোরবেলা অভ্ররা তৈরী হয়ে নিলো। মেসোমশাই তার রাইফেল নিয়ে তৈরী হলেন। তিনজনের পায়ে উঁচু গাম বুট। অভ্র আর দীপের হাতে টর্চ আর ছোট ছুটি লাঠি। আর বড়ো একটা শিশি।

মেসোমশাই ইতিমধ্যে আসল জায়গাটার একটা নক্সাও করে নিয়েছেন।

এবার যাত্রা শুরু হলো।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা জঙ্গলের মধ্যের রাস্তায় এক জায়গায় এসে থামলো।

'বাহাদুর এখানে গাড়িতে থাকবে, আমাদের হেঁটে ঢুকতে হবে', মেসোমশাই বললেন।

অভ্র আর দীপ উত্তেজনায় কাঁপছিলো। জঙ্গলে ঢোকার জন্য ওরা ছটফট করছে যেন।

জঙ্গল এখানে তেমন গভীর নয়। ওরা এবার এগিয়ে চললো পায়ে চলা পথ বেয়ে।

অভ্রর টর্চ মাঝে মাঝে পড়ছে গাছের গোড়াগুলোয় যেখানে তেমন সূর্যের আলো পৌঁছায় নি।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর ওরা বেশ গভীর জঙ্গলে এসে পড়লো।

'এটাই সেই জায়গা মনে হচ্ছে।' মেসোমশাই বললেন।

অভ্র আর দীপ মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওদের চোখ তখন উত্তেজনায় জ্বলতে চাইছে।

চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ আর প্রচুর ঘন ঝোপ। সেই রকম একটা ঝোপে লাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করেই অভ্র চাপা শব্দ করে উঠলো।

'দীপ!'

'কি হলো?'

'ওই দেখ্?' অভ্র আঙুল তুললো।

সত্যিই অভাবনীয় দৃশ্য। ততক্ষণে মেসোমশাইও দেখতে পেয়েছেন। দলে দলে নীল বর্ণ ক্ষুদে মাকড়সার মতোই কিছু ওদের পায়ের চারপাশে কিলবিল করে চলেছিলো কিন্তু পায়ে পুরু গামবুট থাকায় কিছুই করতে পারছিলো না তারা।

'শিগগীর শিশিটা দাও' হাতে গ্লাভস পরতে পরতে বললেন মেসোমশাই, 'ওদের ধরতেই হবে।'

কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো সেগুলোকে ধরতে যেতেই। মাকড়সাগুলো পিছলে গিয়েই যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। আকারে ওগুলো সাধারণ মাকড়সারই মতো।

কিন্তু আরও বিস্ময় ওদের জন্য অপেক্ষা করে চলেছিলো। অদ্ভুত একটা হিস্ হিস্ শব্দে সবাই চমকে তাকালো সামনের দিকে।

সামনের ঘন ঝোপের আড়াল থেকে গোলাকার একটা অদ্ভুত মাঝারি আকারের পদার্থ গাছপালা ভেদ করে সটান ওপরে উঠে নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেলো। গাছপালা থাকায় ভালো করে ওরা দেখতেও পারলো না।

অভ্র আর দীপ অবাক হয়েই তাকালো মেসোমশাইয়ের দিকে।

'ওটা কি মেসোমশাই?' অভ্রই প্রশ্ন করলো।

মেসোমশাই তখন উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

'অভ্র, দীপ বুঝতে পারছো না, কি দারুণ জিনিস আমরা দেখলাম।' তিনি বললেন।

'ওটাই কি তবে নীল মাকড়সার রহস্যের জন্য দায়ী?' অভ্র আর দীপ একসঙ্গে প্রশ্ন করলো।

'কোন সন্দেহ নেই। ওটা কি জানো? ওটা কোন অজানা গ্রহের আকাশযান, এছাড়া কিছুই হতে পারে না। ওই নীল বিষাক্ত মাকড়সা ওরাই এখানে ছেড়েছিলো এলাকাটা জনশূন্য করবে বলে। কি জানি কি তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। আমাদের ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে চলেছিলো—। মাকড়সাগুলোকে ধরতে যেতে ওরা বুঝে নেয় ওদের রহস্য আমরা জেনে ফেলেছি, তাই ওরা পালিয়ে গেলো। একটা মাকড়সাও যদি ধরতে পারতাম…', দুঃখিত শোনালো মেসোমশাইয়ের গলা।

'কিন্তু আমাদের কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না মেসোমশাই', দীপ বললো।

'তাতে কিছু যায় আসে না, দীপ। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই আবার আমরা প্রমাণ পেয়ে যাবো। তবে, পালামৌ-তে নীল মাকড়সার অত্যাচার আর ঘটবে না সেটা জোর গলাতেই বলতে পারি।'

পালামৌ রহস্যের সত্যিই ওখানে ইতি ঘটেছিলো। নীল মাকড়সা সেখানে আর দেখা যায় নি।

———

কাঁঠাল চুরি / রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী

অনেক কাল আগের কথা। হুগলী জেলার এক জমিদার স্থানীয় আদালতে এক মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলার বিষয় বস্তু হল, কতকগুলো লোক একদিন রাত্রে তাঁর বাগান থেকে কাঁঠাল চুরি ‍ ‍ছে। একটি কাঁঠালও বাগানে অবশিষ্ট রাখেনি। লোকগুলো ভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। ভিন্ন জমিদারের খাস প্রজা। সেই জমিদারের সঙ্গে আবার প্রতিপক্ষ জমিদারের অনেকদিন থেকে একটা রেষারেষি চলে আসছে। অতএব এক্ষেত্রে আপসে কোনরকম মীমাংসা একেবারেই অসম্ভব। একমাত্র আইনের আশ্রয় ছাড়া কোন উপায় নেই।

চুরির খবর পেয়ে পুলিসের লোকেরা যথাসময়ে জমিদারের কাঁঠাল বাগানে উপস্থিত হল, কিন্তু চোরাই কাঁঠালের কোনরকম হদিস করতে পারল না। শেষে ভিন্ন গ্রামের কয়েকজন লোককে কাঁঠাল চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করে আটক করল।

লোকগুলোকে আটক করলেও পুলিস তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পেল না। এক্ষেত্রে মামলায় ফল ভাল হয় না। কাঁঠাল বাগানের মালিক, জমিদার মশাই একথা ভালভাবেই জানতেন। তবু তিনি এই মামলা চালিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। কারণ তাতে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। প্রথমত: চোর অপবাদে আটক ঐ লো‌কগুলো সমুচিত শিক্ষা পাবে। ভিন্ন জমিদারের প্রজা হলেও তারা প্রভুর কাছ থেকে কোন রকম আর্থিক সাহায্য পাবে না। মামলা চলল অর্থের প্রয়োজন। তাদের এমন সঙ্গতি নেই যে মামলার খরচ চালায়। তাছাড়া লোকগুলো মোটেই সৎ প্রকৃতির নয়। সুযোগ পেলেই চুরি করে। তাদের কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই। খেটে খাবার মানুষও তারা নয়। অতএব তাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ভিন্ন গ্রামের জমিদার মশাই অনেকটা দাম্ভিক প্রকৃতির। অর্থ আর প্রতিপত্তির দম্ভে কাউকে বড় একটা আমল দিতে চান না। এই অবস্থায় তাঁর কয়েকজন খাস প্রজা কারাবরণ করলে জমিদারের প্রভাব প্রতিপত্তি খানকটা বিনষ্ট হতে পারে। সেই সুযোগে তাঁর আচার আচরণেরও খানিকটা পরিবর্তন ঘটতে পারে।

এদিকে মামলা শুরু হতেই ঐ লোকগুলো নিজেদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের জমিদারকে ধরে বসল, যে করেই হোক তাদের বাঁচাতে হবে। তারা জমিদারের খাস প্রজা। অন্য এক জমিদার চোর অপবাদ দিয়ে তাদের হাজতে বাস করালে, তা শুধু গ্রামবাসীর অপমান হবে না, জমিদারেরও সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। লোকগুলোর কথা শুনে তাদের জমিদার চিন্তা করে দেখলেন, কথাটা সত্যি। প্রজাদের সঙ্গে তাঁরও মান অপমান জড়িয়ে আছে। মামলার ফল বিপরীত হলে তিনি আর প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রজাদের অভয় দিয়ে বললেন, 'তোদের কোন ভয় নেই। মামলার খরচ পত্তর আমিই চালাব।' লোকগুলো খুশী মনে জমিদারের জয় ধ্বনি করে সেদিনকার মত বিদায় নিল।

এরপর দুই জমিদারের মধ্যে ধনবল ও জনবলের আধিপত্য নিয়ে রেষারেষি শুরু হল শহরময় একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে পুলিস বামালের কোন হদিস করতে না পারায় মামলা আরও কঠিন হয়ে পড়ল। আবার মামলা জটিল হয়ে পড়লে বিচারকের পক্ষে সঠিক রায় দেওয়া অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে।

বিচারকের আসনে ছিলেন তখন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের একজন সুখ্যাত কবি। মামলার বিবরণ শুনে রঙ্গলাল এতটুকু বিচলিত হলেন না। ধীর মস্তিষ্কে এবং অতি মনোযোগ সহকারে উভয় পক্ষের শুনানী পরীক্ষা করে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ একসময় তাঁর মনে হল, কাঁঠাল চুরি করতে গেলে কাঁঠালের আঠা গায়ে মাথায় পড়বেই। কাঁঠালের আঠা বড় শক্ত জিনিস,—সহজে ছাড়েনা, অনেকদিন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব থাকে। কথাটা চিন্তা করে বিচারক খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। দেখতে দেখতে দু'পক্ষের শুনানী শেষ হয়ে গেল। এবার রায় দেবার পালা। সেদিন এজলাসে এসেই বিচারক হুকুম দিলেন,—আসামীদের মাথার চুল একবার পরীক্ষা করা হোক। বিচারকের আদেশ পেয়ে কর্মচারীরা তখুনি হুকুম তামিল করতে এগিয়ে গেল। শেষে পরীক্ষা করে দেখা গেল, কয়েকজন আসামীর মাথার চুলে তখনও কাঁঠালের আঠা লেগে রয়েছে। এরপরে প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করতে কোন অসুবিধা হল না। যাদের মাথার চুলে কাঁঠালের আঠা পাওয়া গেল না, তাদের সকলকে মুক্তি দিয়ে বিচারক প্রকৃত অপরাধীদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এই রকম একটা জটিল মামলা হঠাৎ নাটকীয় ভাবে সেদিন নিষ্পত্তি হয়ে গেল। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

———

কবরের বাসিন্দা (৪২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রথম দৃশ্যে গাঁয়ের একটা গির্জা দেখানো হল। গির্জার খানিকটা দূরে গোরস্থান। চাঁদের ম্লান আলো। এক একটা কবরের ওপরে পাথরের স্ল্যাবে নাম লেখা।

ক্যামেরার চোখ একটা কবরের ওপর স্থির হয়! সাউণ্ড-ট্র্যাকে-দ্রুতলয়ের বাজনা।

তারপর

আমরা ভুলে গেলাম যে আমরা সিনেমা দেখছি।

কবরের মাটি কাঁপছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। যেন কবরে ভেতর থেকে কিছু একটা উঠে আসছে। ঝুরো ঝুরো মাটি চারপাশে ছিটকে পড়ছে। মাটির ভেতর থেকে উঠে আসছে....

একটা হাত। মানুষের হাত। কিন্তু, ঠিক মানুষের মত নয় হাড়গুলো ঠিক আছে, এখানে ওখানে মাংস, দু এক জায়গায় টুকরো টুকরো চামড়া, তাতে শ্যাওলা আর মাটি লেগে আছে। নখগুলো লম্বা, ধারালো, জন্তুর মত।

মাটি কাঁপে। আর একটা হাত উঠে আসে। আধখানা হাত শুধু হাড়, এবড়োখেবড়ো কালচে মাংস, শ্যাওলামাখা চামড়া ঝুলছে, ধারালো নখ মাটি আঁকড়ে ধরে।

তারপর ছায়া-আলো-ছায়ার মধ্যে উঠে আসে কালো পোশাকে ঢাকা একটা মানুষের দাঘল শরীর।

মুখটা দর্শকের দিকে ঘুরছে। সেই মুহূর্তে চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ে। অস্পষ্ট দেখা যায় লম্বা চুল, উঁচু কপাল, বাঁকা ভুরু, বন্ধ চোখ, টিকলো নাকের ডগা ঈগলের ঠোঁটের মত ঈষৎ বাঁকা, পাতলা ঠোঁট,

শক্ত চোয়াল।

ঠিক তখনই আকাশে মেঘ সরে যায়। স্পষ্ট দেখা যায়, পাতলা ঠোঁটে পোকা ধরেছে, কপালের ও গালের মাংস পচে গেছে, মাথার চুলে মাটি আর শ্যাওলার জট।

চোখ দুটো খুলে যায়। কী ভয়ংকর সেই চোখদুটোর দৃষ্টি! বরফের মত ঠাণ্ডা, অথচ আগুনের মত জ্বলছে।

কবরের বাসিন্দা মাটির ওপর উঠে এসেছে। দূরে গাঁয়ের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকায় অশরীরী। তার চোখ দুটোয় ঝলসে ওঠে ঘৃণা, রাগ, প্রতিশোধের দুরন্ত ইচ্ছা। সে আলোর দিকে হেঁটে যায়। যেন মৃত্যু হাঁটছে জীবনের দিকে।

আমরা দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত, সম্মোহিতের মত দেখছিলাম। অতীন সেন ফিল্মের প্রযোজক-পরিচালক। এঁদো ডোবাকে কি করে কল্লোলিনী নদী বানাতে হয়, ধুমসী বুড়ীকে কি করে সিনেমার সুন্দরী নায়িকা বানানো যায় এবং পঞ্চাশ বছরের বুড়ো কি করে বাংলা সিনেমার অনুপকুমার সাজে—সব ওঁর জানা আছে। আমি ভৌতিক গল্প লিখি। সুতরাং গল্পের গরু কিভাবে গাছে চড়ে, আমি ভালোই জানি। তাছাড়া আমরা দুজনেই দেদার বিদেশী ভৌতিক ফিল্ম দেখেছি। ক্রিস্টফার লী বা বরিস কারলফ কস্মিনকালে আমাদের ভয় দেখাতে পারেনি।

অথচ এই মালয়ালাম ফিল্মে প্রেতের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন···নাম পিটার সম্মুখম্, ইংরেজী টাইটল আগেই জানিয়েছে....ওঁর অভিনয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা ঠিক অভিনয় নয়।

গল্পটা আহামরি কিছু নয়। পিটার এক যুবক বিজ্ঞানী। সে একটা নতুন ওষুধের ফরমূলা আবিষ্কার করেছে। তার এক ডাক্তার বন্ধু সেই ফরমূলার লোভে তাকে খুন করে। এখন কবর থেকে উঠে এসে প্রতিশোধ নেবে পিটার।

অবশ্য পিটার একা নয়। তাকে সাহায্য করে গাঁয়ের কিছু শয়তান-উপাসক। এই শয়তান-উপাসনা বা ব্ল্যাক মাসের ব্যাপারটা সিনেমায় দারুণ দেখানো হয়েছে। কবরস্থানে জড়ো হয়েছে কালো পোশাকপরা বিশ্রী চেহারার শয়তান উপাসক মেয়ে পুরুষ। কবর-থেকে উঠে আসা পিটার তাদের কাছে শয়তানের দূত। মুখ ও হাতের চামড়া খসে খসে পড়ছে, মাটির দিকে দুহাত বাড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে পিটার। ছোট্ট একটা শিশুকে ধরে এনেছে শয়তান-উপাসকেরা। পিটারের হাতে ছোরা, ঠাণ্ডা চোখে আগুন। ছোরা আমূল বিঁধে যায় শিশুর বুকে। রক্ত ঝরে। রক্ত কবরের উপর গড়িয়ে যায়। সেই মুহূর্তে পাতালের গভীর থেকে বেজে ওঠে অশরীরী হাসির শব্দ। রক্তের তৃষ্ণা মিটেছে বলে শয়তান হাসছে।

শেষ দৃশ্যে সেই ডাক্তারকে কিডন্যাপ করে কবর-স্থানে নিয়ে আসে শয়তান উপাসকেরা। পিটার তাকে হত্যা করবে। কিন্তু তার আগেই খবর পেয়ে ছুটে আসে গাঁয়ের মানুষ এবং পুলিস। গাঁয়ের মুখিরা পুলিসকে বোঝায়, রুপোর বুলেট ছাড়া প্রেতকে খতম করা যায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে বেঁধে পিটারের বুকে। সে কবরের ওপর একা দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশে অনেক গুলো লাস। তার একদা-বন্ধু পরে শত্রু সেই ডাক্তার মরেছে। শয়তান-উপাসকেরাও খতম। গুলিবিদ্ধ কঙ্কাল মাটির দিকে হাত বাড়ায়। রাইফেলের

গর্জন ঘাপিয়ে জেগে ওঠে কঙ্কালের অশরীরী স্বর। সে প্রার্থনা করছে। ঈশ্বরের কাছে নয়, শয়তানের কাছে। মুখ, কপাল, ঠোঁটে আর চামড়া বা মাংস নেই, হাতটা এখন শুধুই হাড়—তবু সে এখনও দাড়িয়ে আছে। হঠাৎ মাটির ভেতর থেকে গুমগুম করে একটা শব্দ হয়। মাটি ফেটে যায়। আগুন ঝলসে ওঠে। সেই আগুনের আড়ালে মাটির নীচে অদৃশ্য হয় পিটার। শয়তান তার দূতকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে।

হলে আলো জ্বলে উঠলো।

অতীন সেন : দীঘল চেহারা, মাথায় চুলে সামান্য পাক ধরেছে, পরনে পিন্‌স্টাইল টেরিন সুট—উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—

'পিটার সম্মুখম্‌···হরর স্টার অফ দ্য সেঞ্চুরী....তোমার নায়ক'

'কিন্তু ও তো বাংলা জানেনা'

'শিখে নেবে। দরকার হলে ডাবিং করা হবে।'

মালয়ালাম ফিল্মটা কিন্তু দুদিন পরেই দক্ষিণ কলকাতার ওই হল থেকে তুলে নেওয়া হল।

দারুণ হিট বই। অথচ···

ডিস্ট্রিবিউটর জানালেন—

'ওটা কমার্সিয়্যাল ফিল্ম নয়। ডাইরেক্টর আব্রাহাম কোন প্রাইভেট গ্রুপের পক্ষ থেকে এই ফিল্ম তুলেছিলেন। ভুলক্রমে ওটা এই ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে এসে যায়। এখন ওরা আপত্তি করায় ফিল্ম দেখানো বন্ধ হল।

পিটার সম্মুখমের ঠিকানা পাওয়া গেল না। তবে ডাইরেক্টর ও, পি, আব্রাহাম আরও অনেক ফিল্ম পরিচালনা করেছেন। তাঁর ঠিকানা পাওয়া শক্ত নয়।

তাঁকেই টেলিগ্রাম করলেন অতীন সেন।

ঠিক পাঁচদিন পরে প্রত্যেকটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—'মালয়ালাম ফিল্মের খ্যাত-নামা হরর-স্টার পিটার সম্মুখম্‌ এবার বাংলা ভৌতিক ফিল্ম অশরীরী অতিথির নায়ক হবেন।'

টেলিগ্রাম পাঠানোর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতায় এসে পৌছুলো পিটার সম্মুখম্‌। চেহারাটা···ফিল্মের মতোই, না, কঙ্কাল নয়, চামড়া বা মাংস খসে পড়ছে না। কিন্তু অদ্ভুত। খুব লম্বা ফ্যাকাসে মুখ, পাতলা ঠোঁট এবং চোখদুটো···ঠাণ্ডা হিম, অথচ কোথায় যেন আগুন জ্বলছে।

ইংরেজী ভালোই বলে পিটার। বললো—

'নো পাবলিসিটি।'

অতীন সেন হেসে বললেন—

'নো পাবলিসিটি? দেন, নো ফিল্ম, নো স্টার—'

কিন্তু পিটার কোনরকম ইনটারভিউ দিতে রাজী নয়, এমনকি খবরের কাগজে ফোটো ছাপাতেও গররাজী।

তার বক্তব্যটা একটু অদ্ভুত।

সংক্ষেপ করলে এরকম দাঁড়ায়—

কেরলে কিছু খ্রীষ্টান সত্যিই নাকি কবরস্থানে শয়তানের উপাসনা করে। এই শয়তান উপাসকরা তাদের গোষ্ঠীর হয়ে একটা ফিল্ম তুলতে বলে ডাইরেক্টর ও, পি আব্রাহামকে। আব্রাহাম নিজেও নাকি ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। পিটার সম্মুখম্‌ নিজেও শয়তান-উপাসকদের এক জন। তাকে নায়ক করে এই ফিল্ম তোলা হয়। ঘটনাচক্রে এই ফিল্মের একটা প্রিণ্ট কলকাতার ডিস্ট্রিবিউটর চ্যানেলে আসে এবং পাবলিককে

দেখানো হয়। এটা নাকি আদৌ ওদের উদ্দেশ্য ছিল না। শয়তান-উপাসকদের এমন ধারণা হয়েছে, আব্রাহাম এবং পিটার নিজেদের নামডাক বাড়ানোর জন্যে এটা করেছে। শয়তান-উপাসনার ঘটনা বাইরের লোক জানলো, এটা ওরা পছন্দ করছে না। ওরা পিটার সম্মুখম্‌কে খুন করতে পারে। তাই আমাদের টেলিগ্রাম তার কাছে পৌঁছুতেই সে কলকাতায় পালিয়ে এসেছে। আমরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খুব অন্যায় করেছি। কেননা এখন শয়তান-উপাসকরা তাকে কলকাতা অবধি ধাওয়া করবে। ফিল্মে পার্ট করতে তার আপত্তি নেই। তবে কোন ইন্টারভিউ, কোন পাবলিসিটি চলবে না। এবং তার থেকেও বড় কথা, সে কোন্ হোটেলে থাকবে, সে আমাদের কাউকে জানাবে না।

আমরা অবাক হয়ে উঠলাম, হরর ফিল্মের অভিনেতা পিটার সত্যিই ভূত-প্রেত-দত্যি-দানা—শয়তান.ব্লাক ম্যাজিক বিশ্বাস করে। বরিস কারলফ বা ক্রিস্টফার লী যতোই দানব বা ড্রাকুলা সাজুন, এসব ব্যাপার তাঁরা গাঁজাখুরি বলেই মনে করেন। পিটার সম্মুখম অভিনয় আর জীবনের তফাত বোঝে না। ওর বক্তব্যকে প্রথমে আমরা তেমন পাত্তা দিইনি। কিন্তু এক হপ্তা পরে 'স্ক্রীন' ও 'ইনডিয়ান এক্সপ্রেস' একটা দুঃসংবাদ জানালো।

'মাই লভ', 'কদল কদল' এবং অন্যান্য মালায়ালাম ফিল্মের পরিচালক ও, পি আব্রাহাম ত্রিবান্দ্রমের এক হোটেলে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে খুন হয়েছেন। তাঁর গলা টিপে খুন করা হয়েছে এবং পেটের ওপর ছোরা দিয়ে উলটো করে ক্রশ আঁকা হয়েছে।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথা আমরা সবাই জানি। 'ক্রশ' খ্রীষ্টান ধর্মে যীশুর পবিত্র প্রতীক। কিন্তু শয়তান উপাসকদের কাছে উল্টো-করে আকা ক্রশচিহ্ন শয়তানের প্রতীক।

কিছুদিন আগে শয়তান উপাসকদের একটা গোষ্ঠীর হয়ে একটা ফিল্ম তুলেছিলেন আব্রাহাম। সেটা ঘটনাচক্রে কলকাতায় দেখানো হয়। খুব সম্ভব এতেই চটে যেয়ে আব্রাহামকে তারা খুন করেছে।

···পিটার সম্মুখম কোথায়, কোন হোটেলে উঠেছে কাউকে জানায়নি। অবশ্য রোজ স্টুডিওয় আসে। ওকে বাংলা শেখানোর কাজ বিশেষ এগোলনা। শেষ অবধি ঠিক হল, ওর ডায়ালগ একদম কম থাকবে, সেটুকু ডাবিং করলেই চলবে।

'অশরীরী অতিথি'র সেটে দ্বিতীয় দিনেই ঝামেলা বাধলো। একজন 'এক্সট্রা'-কে দেখে হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পিটার। মারামারি, ধস্তা ধস্তির পর পর জামার আড়াল থেকে একটা পিস্তল বের করে পিটার আমাদের দেখালো। 'এক্সট্রা-কে অ্যারেস্ট করা হল। লোকটা নাকি কোচিনের বাসিন্দা। পুলিশ 'আড়ং-ধোলাই' দিলে সে স্বীকার করলো, সে 'লুসিফার'-এর অর্ডার মাফিক এইসব করেছে। লুসিফার অর্থাৎ শয়তান···

অতীনদা পিটারকে বডিগার্ড দিতে চেয়েছিলেন। ও নিল না। স্টুডিওয় পুলিস পাহারা দিচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ড মোতায়েন করেছেন অতীনদা। আজ স্যুটিং শুরু হবে।

সকাল আটটায় স্টুডিও আসার কথা পিটারের।

আটটা বাজলো, নটা, দশটা,

পিটারের পাত্তা নেই।

বেজার মুখে অতীনদা বললেন—

একটা সেটে হাজার পঁচিশ টাকা গেছে।

টেকনিসিয়ান, সাইড-অ্যাক্টর, এক্সট্রা—কেউ পয়সা ছাড়বে না। লোডশেডিং হলে এমনিতেই কাজ বন্ধ হবে। তার থেকে শ্যুটিং সুরু করা যাক। পিটার সম্মুখমের সীন্ বাকী থাক পরে শ্যুটিং হবে। 'আর যদি ও উধাও হয়ে যায়, অন্য স্টার নিতে হবে।'

ইন্দ্রপুরীর চার নম্বর ষ্টেজ।

আমার গল্পের পটভূমি উনবিংশ শতাব্দীর এক সাহেবের তৈরী বাংলোবাড়ি। ছায়া-আলো-ছায়া, ঘুরোনো সিঁড়ি, মাকড়সার জাল, ধূলো। কাছা কাছি জনবসতি নেই। একটু দূরে নদী, বালির চর. এখানে থাকতেন নীল কুঠির মালিক জন চ্যানিং। প্রজারা নীল বুনতে না চাইলে তাদের মেয়ে বউদের এখানে ধরে আনা হত। মেয়েমানুষের খোলা পিঠে চাবুক বসাতো সাহেব। তারপর একদিন...গাঁয়ের মানুষ খেপে উঠলো। বঁড়শি আর হাঁসুয়ার ঘায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন সাহেবের লাশ পরে ওর বাগানে মাটিচাপা দিয়েছিল তার বন্ধুরা। সেই কবর আজও আছে। কবরের মাথার কাছে কালো পাথরের ফলকে জন চ্যানিং এর নাম লেখা।

এই বাংলো বাড়িটা কিনেছে ডাক্তার অসীম রায়। তার বউ সুস্মিতা সারা দিন ঝি চাকর দিয়ে বাড়ি সাফ করিয়েছে। এখন ডাক্তার চলে গেছে। সন্ধ্যের পর ঝি চাকর কেউ বাড়িতে থাকতে রাজী নয়। একা একা বাগানে ঘুরছে সুস্মিতা।

সেটটা সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

সুস্মিতার ভূমিকায় অভিনয় করছে তরুণী অভিনেত্রী রীতা রায়। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে সে কবরের সামনে থমকে দাঁড়ায়। কবরের ফলকে লেখা আছে প্রেত আবাহনের কিছু মন্ত্র। রীতা পড়বে এবং তখনই কবর থেকে উঠে আসবে নীলকুঠির মালিক শয়তান-উপাসক জন চ্যানিং। কিন্তু যেহেতু জন চ্যানিং এর ভূমিকা যে অভিনয় করবে, সেই পিটার সম্মুখম এখনও আসেনি, রীতার মন্ত্র পড়া অবধি দৃশ্যটুকু নেওয়া হবে। চ্যানিং সাহেব, পিটার ইংরেজীতে কথা বললেই চলবে, মাঝে মাঝে ভাঙা বাংলা, তাও না পারলে ডাবিং।

শ্যুটিং শুরু হল।

ঝুঁকে পড়ে ফলকে লেখা আখরগুলো পড়ছে রীতা।

সাউণ্ড ট্রাকে অদ্ভুত শব্দ।

কবরের ঢাকনাটা আসলে ধাতুর, ভেতরে স্প্রিং. উপরে মাটি।

ক্যামেরার চোখ এখন কবরের দিকে।

ঢাকনা খুলছে, মাটি ছিটকে পড়ছে।

আতংকিত চোখে কবরের দিকে তাকালো রীতা।

'কাট্'

—অতীনদা বলতে গেলেন, কথাটা তাঁর মুখে আটকে গেল।

কবরের ভেতরে শুয়ে আছে পিটার সম্মুখম। কালো পোশাক, পেটের কাছটা ছেঁড়া। সেখানে চামড়ার ওপরে রক্তে আঁকা উলটো করা ক্রশ। দুর্দান্ত মেক আপ করেছে সম্মুখম। স্টুডিওর মেক আপ নয়। বোধহয় নিজে মেক আপ করে হোটেল থেকে এসেছে। তারপর আমাদের চমক দেবে বলে কবরে ঢুকে অপেক্ষা করছিল।

ক্যামেরাম্যানের দিকে হাত নাড়লেন অতীনদা।

শ্যুটিং চলবে।

ফিল্মের চিত্রনাট্যমাফিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে রীতা।

পিটার খুব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। মরা চুলে ছাতা ও শ্যাওলা, কপাল নাক ও ঠোঁটের

(শেষাংশ ৬৬ পৃষ্ঠায়)

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে বিরাট ভূখণ্ডের নাম এখন অরুণাচল, আগে তাকে বলা হত N E F A অর্থাৎ নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি।

তারই অনেক জেলার মধ্যে একটি হল সীয়াং। সীয়াংয়ের একটি ছোট শহরতলীর নাম ছিল পাসিঘাট।

সেই পাসিঘাটে প্রথমে যাবার পর অমল রায় আর তার বন্ধু, তখনকার পুলিসের বিখ্যাত ডিটেকটিভ নীলম মুখার্জীর মনে হয়েছিল, জায়গাটা ঠিক যেন গল্পে পড়া আফ্রিকার মতন।

সীয়াংয়ের তীরে বিভীষিকা

সুহাস চৌধুরী

পাহাড়ের নীচে কোথাও গভীর জঙ্গল, কোথাও বুনো ঝোপের মধ্যে ঝর্ণা। অচেনা গাছ গাছালি, অদ্ভুত রকমের ফুল, বিচিত্র রকমের পাখপাখালি। সব মিলিয়ে দিন দুপুরেও মনে হয়েছিল, এ বুঝি কোনো মায়াবী রাজ্য। সীয়াং নদীর কাকচক্ষু জলে এই রহস্যপুরীর ছবি যেন মাঝে মাঝে স্থির হয়ে থাকত। সন্ধ্যে হতে না হতেই গভীর অন্ধকার। শুধু কি তাই? নির্জন রাত্রে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে সীয়াং নদীর তীর থেকে ছোট মেয়ের কণ্ঠ শোনা যেত "বাবা, তুমি এখান থেকে চলে যাও বাবা···বাবা আমি অনীতা বলছি...।" দুজন শক্তিমান আদিবাসী ভৃত্যের চোখে মুখে ফুটে উঠতো ভয়ের চিহ্ন। সেই সময় হঠাৎ-হঠাৎ মেহেরা সাহেবের কোঁপানির আওয়াজে পুরো কোয়ার্টার-যেন কেঁপে উঠতো। অমল চমকে দেখতো, অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ নীলম মুখার্জী থমকে দাঁড়িয়েছে। তার দুটো লম্বা হাত তখন নিজের ঘুম পোশাকের ভেতর। সেখানে দুটো অটোমেটিক রিভলবার।

কিন্তু কলকাতার জনবহুল শহর ছেড়ে কেন তারা দুজনে চারদিন চার-রাত্রি জেগে ওই গা ছমছমে পাসিঘাটে গিয়েছিল?

সে ঘটনা বুঝি যে কোনো গোয়েন্দা রহস্য কাহিনী-কেও হার মানায়।

তখন ইংরেজের শাসনকাল। নীলম মুখার্জীর আর মেহেরা সাহেবের মতন দুর্দান্ত গোয়েন্দা আর নির্ভীক জেলা শাসকের নামে গুণ্ডা খুনীদেরও বুক কাঁপতো ভয়ে। অথচ অদ্ভুত এক রহস্যের কাছে ওরাও যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

কান্তি মেহেরা দেশ স্বাধীন হবার বেশ কয়েক বছর আগে উত্তর প্রদেশ থেকে স্বেচ্ছায় পাসিঘাটের জেলা শাসকের চাকরি নিয়ে এসেছিলেন। লখনৌ শহরে মেহেরা সাহেব সৎ অত্যন্ত সৎ অথচ প্রচণ্ড সাহসী, এবং কড়া বলে পরিচিত ছিলেন। কোনো

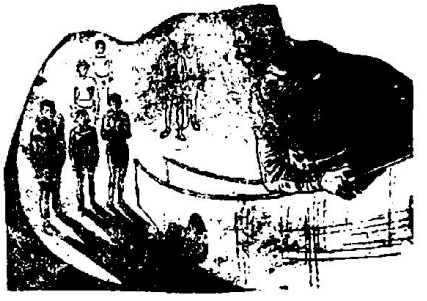

অন্যায়, অসভ্যতা তিনি কখনও ক্ষমা করতেন না। আবার গরিবদের প্রতি তাঁর মায়া মমতা ছিল। সে জন্যে তিনি ছিলেন অপরাধীদের কাছে ভয়ঙ্কর আর নিরীহ লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো, ভাল বাসতো।

কিন্তু মেহেরা সাহেবের জীবনটা ছিল দুঃখের। তিন বছরের মেয়ে অনীতাকে রেখে অনীতার মা এইদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে মারা যান। মেয়েকে স্নেহে আদরে আট নয় বছর পর্যন্ত বড় করে তুলেছিলেন তিনি। ফুটফুটে ফুলের মতন অনীতাও একদিন হঠাৎ স্কুল থেকে ফিরতে গিয়ে গাড়ী চাপা পড়ে। তাঁকেও বাঁচানো যায়নি।

পরপর তাঁর এই শোকে পাড়াপ্রতিবেশীরাও চোখের জল ফেলেছিলেন। মেহেরা সাহেবকে খুব ভালবাসতেন তার ওপরওয়ালা ইংরেজ অফিসার। তাঁকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে পাসিঘাটের মতন নিরিবিলি জায়গায় মেহেরা সাহেব চলে আসেন। দেশগড়ার কাজে মন দিয়ে নিজের কষ্ট ভুলতে চেয়েছিলেন মেহেরা সাহেব পাসিঘাটে আসার সময় সঙ্গে কিছু গরিব লোকেদের এনে ছিলেন যাতে তারা নিজেদের ব্যবসা ক'রে জীবনে উন্নতি করতে পারে। নিজের বড় কোয়ার্টারে মেহেরা সাহেবের দুই বিশ্বস্ত ভৃত্য ওমিন পার্টিং আর জিগমী দারাং খুব যত্ন করতো ওদের মনিবকে। কিন্তু হঠাৎ ভারী অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রায়ই রাত্রে তিনি দূর থেকে অবিকল অনীতার গলা শুনতে পেতেন। সে বলতো, বাবা তুমি চলে যাও এখান থেকে। প্রথমে উড়িয়ে দিলেও পরে তাঁর মতন অনেকেই শুনতে লাগল একটি বাচ্চা মেয়ের গলা। একে শোক, তার ওপর এই অলৌকিক ঘটনায় ভেঙে পড়ে কলকাতায় নীলমকে মেহেরা সাহেব চিঠি লেখেন সব জানিয়ে। বিলেতে থাকতে দুজনের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে ছিল। অমল রায় সবে পুলিসের চাকরিতে ঢুকেছে। অল্প বয়েস বলে নীলম একাই আসতে চেয়েছিল। কিন্তু নানা ব্যায়াম, কুংফু, কারাটে শিখে অমলও সাহসী ছেলে হয়েছে। সুতরাং দুজনের আসা হল এই রহস্যপুরী পাসিঘাটে।

প্রথম দিন সাতেক কী যে উত্তেজনার মধ্যে কেটেছিল তা আজও অমলের মনে আছে। সে এখন আবার আমার বন্ধু। এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে।

অমল বলেছিল: "এই ভাবে চলতে চলতে আমি আর মেহেরা সাহেব বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু নীলমদা ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, হঠাৎ সেই অনীতার গলা যেন টেবিলের তলা থেকে ভেসে এল। মেহেরা সাহেব চমকে আমার দিকে তাকালেন। আমিও বেশ ভয় পেয়েছিলুম। নীলমদা হাসছিলেন। তিনি টেবিলের তলা থেকে একটা টেপ রেকর্ডার বের ক'রে বোতাম টিপতেই আবার শোনা গেল অনীতার স্বর···। এই সময় পার্টিং লোকটা হঠাৎ মেহেরা সাহেবর পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বলল, হুজুর আমায় বাঁচান···।

অমল বাকিটুকু যা বলেছিল তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি করুণ। মেহেরা সাহেব যে সব গরিব লোকেদের পাসিঘাটে এনেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রীতম সিং খুব তাড়াতাড়ি ব্যবসায় উন্নতি করছিল। পরে দেখা গেল, সে অসাধু উপায়ে, লোক ঠকিয়ে টাকা রোজ-গার করতো। ধরা পড়ার পরে দুবার সাবধান ক'রে ছিলেন মেহেরা সাহেব। প্রীতম সিংয়ের মেয়ে রূপা অনীতার বন্ধু ছিল। সে অন্যের গলা নকল করতে পারতো। বাবার পরামর্শে অনীতার গলার স্বর টেপরেকর্ড ক'রে ওমিন পার্টিংকে দিয়ে ছিল। সে সরল মানুষ। টাকার লোভে সে ওটা রাত্রে বাজাতো। প্রীতমের উদ্দেশ্য ছিল ভয় পেয়ে মেহেরা সাহেব চলে যাবেন। রূপার মা নাকি

প্রীতম এবং রূপাকে এসব করতে বারণ করেছিল, কিন্তু লোভী লোকেরা এরকমই কাণ্ড করে। যাই হোক, মেহেরা সাহেব ওমিন পার্টিকে গালিগালাজ করলেন শুধু। কিন্তু প্রীতমকে বড় ব্যবসা ছেড়ে চলে যেতে হল।

অমলের গল্প এটুকু শুনে আমি বলেছিলাম কি ভয়ঙ্কর না? এতো সিনেমার গল্পের মতন ..।'

অমল বলল: "দাঁড়াও। এখনও শেষ হয়নি। আমরা যেদিন সরকক্ সেলের স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি হঠাৎ একটা লোক ভোজালি নিয়ে নীলমদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই নীলমদার এক ঘুঁষিতে সে ঘুরপাক খেয়ে গড়িয়ে গেল। আমি কিছু না বুঝে লোকটাকে আরও মারব বলে এগিয়ে যেতেই একজন মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে হিন্দিতে বললেন, হুজুর ওকে ক্ষমা করে দিন....এই নিন ওর ভোজালি। তাকিয়ে দেখি একজন পনেরো বছরের মেয়ে আর ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে। তখনও লোকট. যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। তার পর নীলমদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ওদের চিনতে পারলি। আমি ঠিক তখনও বুঝিনি। নীলমদা বললেন, "ওরা প্রীতম সিং, তার মেয়ে···, আর··· ।"

—×—

কবরের বাসিন্দা (৬৩ পৃষ্ঠার পর)

চামড়া খসে গেছে, হাত দুটোর কিছু হাড় কিছু মাংস। কিসফিস করে কি বললো পিটার।

তারপর...

হঠাৎ কবরের আড়ালে ডুব দিল পিটার।

সবাই চিৎকার করে উঠলো।

আমরা কবরের পাশে যেয়ে দেখলাম—

ভেতরে কিছু নেই !!!

....না কেউ পিটারকে স্টুডিওয় ঢুকতে দেখেনি।

ফিল্ম ডেভেলপ করা হল।

রীতার শট ঠিক উঠেছে।

কবর খুলে যাচ্ছে।

এবং মাটির ভেতর থেকে উঠে আসছে···

রক্তে আঁকা উল্টো করা ক্রশচিহ্ন !!!

আর কিছু নয়।

কোন মানুষ নয়; মানুষের শবদেহও নয়।

সাউণ্ড ট্র্যাক....

পিটারের কণ্ঠস্বর।

সে ফিসফিস করে বলছে—

'৬ নম্বর ডাক্তার লেন

৬ নম্বর ডাক্তর লেনের দোতলার ছোট্ট ঘরে লাসটা পেয়েছিল পুলিশ।

পিটার সম্মুখমকে কে বা কারা গলা টিপে খুন করেছে।

তার পেটের ওপর ছোরার ফলায় রক্তের দাগে আঁকা উলটো করা ক্রশ !!!

অশরীরী অতিথি.....

ভৌতিক ফিল্মের শুটিং বন্ধ করে দিলেন অতীনদা.....

আমিও আর ভৌতিক গল্প লিখিনা।

লিখতে পারি না।

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে.....

কবরের হাঁ করা মুখ, কবরের বাসিন্দার দুটো চোখ, ঠাণ্ডা অথচ কোথায় যেন আগুনের ছোঁয়া....

—×—

ছোট্ট নিরিবিলি ছুটি কাটানো জন্য

মাইথন

আসানসোলের খুবই কাছে মাইথন। অল্প কয়েকদিন ছুটি কাটানোর পক্ষে চমৎকার। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ আসানসোল। সেখান থেকে বাস, মিনিবাস বা ট্রেনে অল্প সময়েই পৌঁছে যাবেন মাইথনে।

মাইথনের পাহাড় ঘেরা শান্ত হ্রদে নৌকাবিহার করুন। ঘুরে আসুন কাছাকাছি কল্যাণেশ্বরীর মন্দির থেকে। প্রাচীন কারুকার্য আর স্থাপত্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। এছাড়া, বরাকরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম (১২শ শতাব্দী) এক মন্দির।

মাইথনের খুব কাছেই আরও দেখার জিনিস আছে। বার্ণপুর ইস্পাত কারখানা, চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা, পাঞ্চেত বাঁধ—একাধিক আধুনিক শিল্প মন্দির।

মাইথনে থাকার জন্য হ্রদের ধারে মনোরম পরিবেশ ফরেস্ট বাংলো রয়েছে। ভাড়া মাথাপিছু ৬ টাকা মাত্র। এছাড়াও ডি. ভি. সি. রেস্ট হাউস বা ইউথ হোস্টেলেও থাকতে পারেন। ভাড়া যৎসামান্যই।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয় বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট) কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : ট্রাভেল টিপস্

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Phone : Office : [illegible]5-4688
Resi [illegible]-4910

With Best Compliments From

MEROLYN ENGINEERING WORKS

Builders & Repairers of Steel-Barge, Flat, Launch, & L. C. T.
and Govt. Contractor

52, JOGENDRA NATH MUKHERJEE ROAD
SALKIA, HOWRAH

With best wishes :

ALLIED CONSTRUCTION

Engineers & Contractors

Post—Kolaghat, Dist—Midnapur

Gram : SEE & AGENTS
OFFICE : 44-8906
43-1346
45-2129

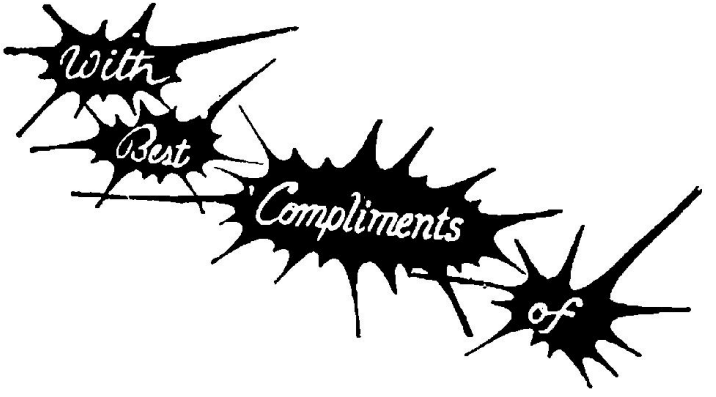

JYOTI AGENCIES PRIVATE LTD.

13, CAMAC STREET (4th Floor)

CALCUTTA-700017

With Best Compliments of

SARKAR BROTHERS

Ghoosuri, Howrah

With best compliments from :

"CHALANTIKA CATERING"

13/B Jogmaya Debi Lane

How-1

Near Kalibabu's Bazar

Phone : 22-6170

With best compliments from :

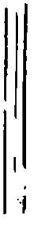

General Order Suppliers & Traders

23A, Netaji Subhas Road

Calcutta-700001

Phone : 26-6221
26-7305

With best compliments from

M/s. MARINE SYNDICATE

Ship Chandlers and General Order Suppliers

11, Malanga Lane

Calcutta-700012

With best compliments from :

Shivmoni & Co.

Biplabi Raah Behari Basu Road

Calcutta-700001

পুজো ও ইদের সময় উৎসবমুখর দিনগুলিতে আপনাদের আনন্দের কথা ভেবে আমাদের কিছু বিশেষ কর্তব্যের বোঝা নিতে হচ্ছে। কারণ আমাদের কর্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আপনাদের নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। অর্থাৎ এই উৎসব উপলক্ষে পথঘাট মানুষে মানুষে ছয়লাপ। আর হকাররা রাস্তা উপচে পড়ে। আর সেই তালে পাল্লা দিয়ে দৈনন্দিন জঞ্জাল জমার পরিমাণটা বেড়ে যায়।

এছাড়াও আছে অধিক বিদ্যুতের চাহিদা। আরও অনেক জল, নাগরিকদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া, যাতে বিভিন্ন বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ তৈরী করার জন্য রাস্তায় বা পার্কে খোঁড়াখুঁড়ি ও অবরোধের ব্যাপার। ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট মেরামতি করে নগর জীবনের যাতায়াতের পথ সুগম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আপনাদের আনন্দের দিনগুলো আরও আনন্দময় করে তুলতে নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক বেশী করে পুরসেবার দায়িত্ব বহন করতে হবে। এর জন্যে আমরা হাসিমুখে প্রস্তুত। আর এই সঙ্গে আমাদের একটি নিবেদনও রাখতে চাই।

এই দিনগুলিতে সবকিছু কাজে বিভেদ বিচ্ছেদ ভুলে আপনারা শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। আপনার বিশৃঙ্খল কার্য্যাবলী যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয়। এছাড়া পুরসভার দৈনন্দিন কাজেও আপনাদের সক্রিয় সাহায্য আমাদের কাম্য।

পুরসভা আপনাদের সকলকে পূজার সাদর সম্ভাষণ ও প্রীতি অভিবাদন জানাচ্ছে।

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

With best compliments from :

卐卐卐
卐卐
卐

Hind Steel Corporation

53, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

With best compliments of :

BERRY RADIO CO.

161/1, Mahatma Gandhi Road, Cal.-700007

Manufacturer of :

BARONY

Transistor Radios

Dealers in

Sudarshan CINEVISTA T. V.
Records, Players, Stereos, Casettes.

With best compliments from :

Ganges Rope Company Ltd.

4, FAIRLIE PLACE

CALCUTTA-700001

Phone : 41-1325

With best compliments of :

MAKALI SUPPLIERS

Office Stationeries & General Order Supplies

Specialist in : Fish, Mutton, Chicken supply in any Office Canteen occassional party, Wedding Birthday Ceremony, Rice ceremony etc.

13/5, Russa Road, (East) 2nd Lane

Calcutta-700 033

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পূজার উৎস, ও ইদুজ্জোহা উপলক্ষে রাজ্যের জনগণের কাছে আমার আবেদন, সংযম ও শৃংখলার সঙ্গে উৎসব পালন করুন। কোনো রকম আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। উৎসবের সময় চাঁদা আদায়ের নামে কোনো ধরনের জুলুম যাতে কেউ করতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিশেষ দায়িত্ব।

পথের ওপর উৎসবের এলাকাকে সম্প্রসারিত করবেন না—কারণ এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাইক্রোফোনের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত রাখুন।

উৎসবের সময় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন।

উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি অটুট রাখুন ও তা আরো সম্প্রসারিত করুন। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের সকল অংশের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্তই প্রয়োজন।

জ্যোতি বসু

আই সি এ-২২১২০/৮১

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

বড়দিনে আগামী সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয়

২টি কমিকস ২টি প্রতিযোগিতা

সেরা একটি সচিত্র কাহিনী

লিখবেন ঃ সমরেশ বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মহাশ্বেতা দেবী, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, অদ্রীশ বর্ধন এবং বীরু চট্টোপাধ্যায় ও অনেকে।

জিম করবেটের বাঘ শিকারের কাহিনী

টারজনকে নিয়ে নতুন গল্প

বিজ্ঞানের প্রশ্ন মালা

ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস অ্যাডভেঞ্চার প্রবন্ধ রঙিন ছবিতে অলৌকিক কাহিনী নিয়ে ঠিক তোমাদের হাতে মাসের প্রথম সপ্তাহে তুলে দেব।

দাম দু'টাকাই থাকবে।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ : ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড : কলিকাতা-৭০০০০১ : ফোন ২২-২৭৭০

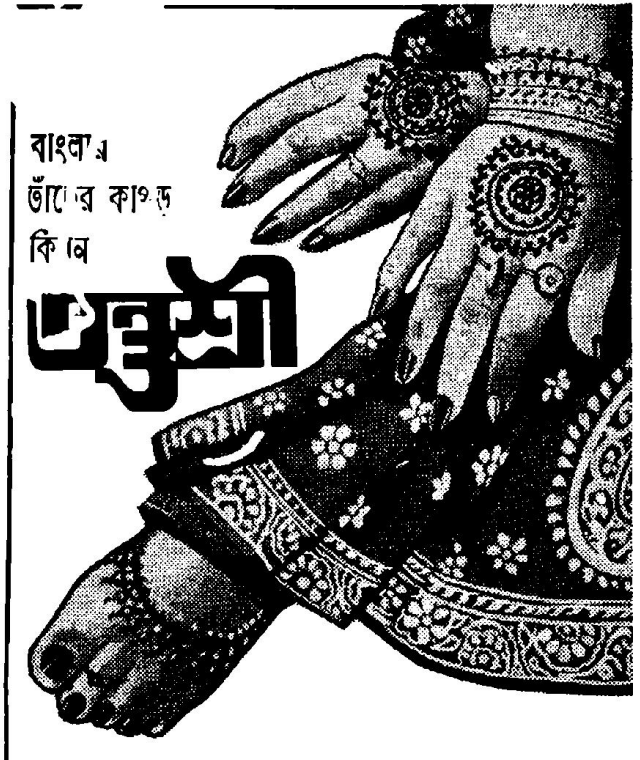

বিক্রয় কেন্দ্র : কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র, করোলবাগ (নয়াদিল্লী)
এবং বাঙ্গালোর (আর্টিলারি রোড)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিঃ
(পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩ ফোন : ২৭-২২৫০, ২৭-২২৫১

মার্কেটিং ডিভিশন : ১এ, অভয় গুহ রোড, কলিকাতা ৬

No. R. N. 32560 77 CHILDRENS DETECTIVE :: NOVEMBER ... 18.

PRAKASHANI : Phone : 22-2770 : Chief Editor, Amitava Sen
Editor, Mahindra Bose from 26, Strand Road, Cal-1
ion & Jayasree Press—Cal-6, Block Royal Halftone Co.
by New Gaya Art Press, Cal-9, Phone : 34-3493
A. H. W.